ইতিহাসে প্রাচীন যুগ

নিশীথরঞ্জন রায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর ১৯৭৯ সালে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসরণে
মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত ॥

Approved by The West Bengal Board of Secondary Education
—Vide Letter No. RBI/79/Syll/H/31, Dated 15. 11. 79, and
Notification No. TB/VI/H/79/27, Dated 5.12.79.

ইতিহাসে প্রাচীন যুগ

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়

ভূতপূর্ব সেক্রেটারী-কিউরেটর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, প্রাক্তন অধ্যাপক
স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
কলিকাতা সেন্ট পল্‌স কলেজের ইতিহাস বিভাগের
ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ।

ALLIED BOOK AGENCY
18/A, SHYAMA CHARAN DEY STREET
Calcutta 700 073

ভূমিকা

আলোচ্য পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে ইতিহাসের নূতন পাঠ্যক্রম অনুসরণে রচিত হইয়াছে। কোন একটি বিশেষ দেশ বা জাতির ইতিহাস অথবা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর গুরুত্ব না দিয়া এবারকার সংশোধিত পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের অগ্রগতির উপর। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠার্থীদের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে প্রাচীন যুগের ইতিহাস। এই ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে মানব সভ্যতার উন্মেষ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত যুগ লইয়া। এই বিরাট পরিধির অন্তর্ভুক্ত মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ, চীন, ইরাণ, প্যালেস্টাইন, গ্রীস ও রোম। এই বইখানিতে অল্প বয়সের ছাত্রছাত্রীদের কাছে গোটা মানবজাতির সভ্যতার উত্থান ও প্রসারের কাহিনী যথাসম্ভব সরল ভাবে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলার জন্য চিত্র, মানচিত্র এবং সময়রেখার অকৃপণ ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি।

শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবকরা বইখানি নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠার্থীদের উপযোগী মনে করিলে আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

জুন, ১৯৭৯

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

১ ইতিহাসের লক্ষ্য

বর্তমানকে আমরা চোখে দেখি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা ভাবি, কিন্তু অতীতকে আমরা পাইতে চাই জানাশোনার নাগালের মধ্যে। বিশাল এই পৃথিবী, বিপুল ইহার জনসংখ্যা। কতো যুগের পর যুগ পার হইয়া চলিয়াছে মানুষের যাত্রা। কবে পৃথিবীর বুকে দেখা দিল প্রথম প্রাণী, কি তাহার পরিচয়, আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতি আর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করিয়া কি ভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে সভ্যতার পথে, পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছিল আদিম যুগের মানুষের বসতি, কি ধরনের ছিল তাহাদের জীবনযাত্রা, কতো অভিজ্ঞতা, দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম, পরীক্ষা, কতো চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পর মানুষ আজ নিজেকে উন্নত সভ্যতার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতে শিখিয়াছে, আমরা প্রত্যেকেই তাহা জানিতে চাই। এই জানার আগ্রহ মিটাইতে পারে ইতিহাস।

পৃথিবীর সব ক'টি অঞ্চল জুড়িয়া একই সময়ে সভ্যতার বিকাশ ঘটে নাই। কোনও একটি দেশের মানুষ যখন সভ্যতার পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তখন অন্যান্য অঞ্চলে মানুষের বসতি পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। কিংবা গড়িয়া উঠিলেও সে অঞ্চলের মানুষ তখনও আগুনের ব্যবহার শিখে নাই ; চাষ-আবাদ বা ঘরবাড়ী তৈয়ারীর কৌশলও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরেও তাহারা বিভিন্ন পথে চলিয়াছে। তাহাদের অগ্রগতির পরিমাণও হইয়াছে বিভিন্ন।

এই কারণে এক একটি দেশকে আলাদা করিয়া দেখিলে চোখে পড়িবে বহু গরমিল। কিন্তু গরমিল সত্ত্বেও মোটামুটি ভাবে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কয়েকটি মূলসূত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের বাধা মানুষ পুরাপুরি মানিয়া লইতে পারে নাই। নদনদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র

কোন কিছুই মানুষের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নাই—এই অভিজ্ঞতা আজিকার দিনের মানুষকে উৎসাহিত করিয়াছে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে অভিযানে। সব রকমের প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করিয়া বাঁচিয়া থাকার প্রেরণা মানুষের ইতিহাসের মূল কথা। অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রসারিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, উদ্যোগ, সফলতা ও অসাফল্যের কাহিনী আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া ইতিহাসের লক্ষ্য।

॥ ক ॥ প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান

প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টা—অতীত কাল এবং সে-যুগের মানুষের কথা জানার আগ্রহ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সে আগ্রহ কতদূর মেটানো সম্ভব? ধর, আদিম যুগের প্রাণী বা মানুষের কথা। সে-যুগের শিল্পী তাহাদের ছবি আঁকিয়া রাখে নাই, তাহাদের সম্পর্কে সে-যুগে কোন পুঁথিও লেখা হয় নাই। ইহার কোনটাই সম্ভব ছিল না; কারণ আদিম মানুষ না জানিত লেখাপড়া, না ছিল তাহার শিল্পজ্ঞান। তবু তাহাদের সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল মিটানো, সম্পূর্ণ না হইলেও, অন্ততঃ কিছুটা সম্ভব। সে-যুগের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় নাই বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা থামিয়া থাকেন নাই। পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে তাঁহারা পুরাকালের ইতিহাস নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইভাবে বহু তথ্য তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

মাটি খোঁড়ার যন্ত্র—আদিম যুগ

তাঁহাদের ব্যবহৃত উপাদান—প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের ফলে মাটির তলায় কোথাও পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন যুগের প্রাণীর কঙ্কাল অথবা সে-যুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্র কিংবা ধাতুর বাসনপত্র, কোদাল কিংবা কুঠার, অথবা কোন সীলমোহর, পোড়ামাটির খেলনা, মূর্তি কিংবা কোন ধাতুনির্মিত অলংকার, পুরানো গৃহের কক্ষ কিংবা

প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ অথবা পাথরের গায়ে লেখা লিপি, মন্দিরের গায়ে **আঁকা চিত্র** কিংবা **প্রাচীন মুদ্রা**। এগুলিকে বলা হয় **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান**। তাছাড়া আছে আরও পরবর্তীকালে লেখা **পুঁথি**।

বহু কাল পর্যন্ত মানুষ বুনো জন্তুজানোয়ার বা পাখীর মতো শব্দ করিয়া বা হাবে-ভাবে-ভঙ্গিতে শুধু মাত্র নিজস্ব উপায়ে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিত। পরবর্তী কালে ছবির সাহায্যে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা হইত। আরও বহু পরে দেখা দিল বর্ণমালা। ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিল নূতন নূতন বর্ণমালা। এই সমস্ত বর্ণমালার সাহায্যে বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় লেখা হইতে লাগিল পুঁথিপত্র। এই ধরনের বহু পুঁথিপত্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। পুরুষানুক্রমে বহুকাল ধরিয়া মানুষ যাহা শুনিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে—সেই সব কাহিনী তাহারা লিখিয়া গিয়াছে পুঁথির পাতায়। এই সব পুঁথিপত্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে প্রাচীনকালের ইতিহাসের মালমশলা। আমাদের দেশের রামায়ণ-মহাভারতের কথাই ধরা যাক্! রামচন্দ্র কিংবা যুধিষ্ঠির নামধারী কোন ব্যক্তি সত্যই ছিলেন কিনা সে প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই,
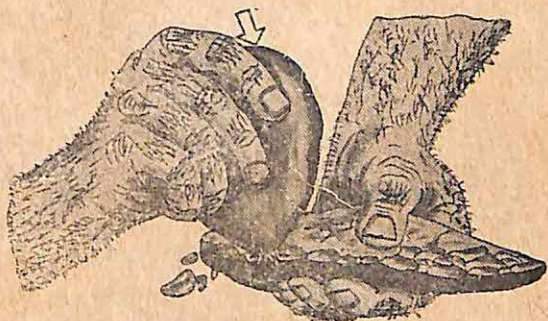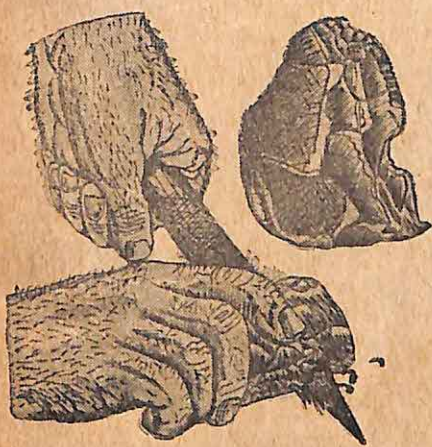
সূক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র —আদিম যুগ

পাথরের হাতিয়ার দিয়া কাঠ কাটার প্রণালী

কিন্তু এই দুটি মহাগ্রন্থে যে সকল স্থানের কথা—নগর, গ্রাম, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্যের কথা—সামাজিক রীতিনীতি, খাদ্য-পানীয়, যাগযজ্ঞ, যুদ্ধপ্রণালী ইত্যাদির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে আমরা সহজেই তুলিয়া ধরিতে পারি সে-যুগের মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী, সে যুগের মানুষের চিন্তাভাবনার কথা, তখনকার সমাজ, ধর্মজীবন এবং রাজ্যশাসন-প্রণালীর পরিচয়।

পরবর্তীকালে ইতিহাসের আরও উপাদান আমরা পাই তখনকার দিনের ঘরবাড়ী, মঠ-মন্দির, মুদ্রা, চিত্রকলার মধ্যে। এগুলির সংখ্যাও প্রচুর। এই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকরা আজ প্রাচীন-কালের ইতিহাস মোটামুটি নির্ভরযোগ্যভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

অনুশীলন

১। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কবে ঘটিয়াছে সন তারিখ দিয়া তাহা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। মানুষের আগেও পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করিত অন্যান্য প্রাণী। সেই সব অতীত যুগের অতিকায় প্রাণী আর বাঁচিয়া নাই। মানুষ তাহাদের তুলনায় দুর্বল, ক্ষুদ্রকায়; তবু বাঁচিয়া আছে। শুধু তাই নয়, প্রাণী হিসাবে মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া গণ্য হয়। প্রথম যুগের মানুষ আর বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধান। তবু আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা জানার জন্য আমাদের আগ্রহের অন্ত নাই। এই আগ্রহ মিটাইতে পারে একমাত্র ইতিহাস।

২। প্রাচীন যুগের আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে সব তথ্য আমাদের জানা সম্ভব নয়। সে যুগে বই লেখা কিংবা ছবি আঁকার রীতি ছিল না। আদিম যুগের মানুষদের ব্যবহৃত নানা ধরনের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘরের ধ্বংসস্তূপ ইত্যাদির সাহায্যে আমরা সেই যুগ এবং সেই যুগের অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারি। এই ধরনের উপাদানকে বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

প্রশ্নমালা

১। উত্তর দাও:

(ক) "অতীতকে আমরা জানাশোনার নাগালের মধ্যে পাইতে চাই।" এই কথাটি মনে রাখিয়া অতীত সম্পর্কে আমরা কি জানিতে চাই তাহা সংক্ষেপে বল। দুটি বাক্যের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর লিখিতে হইবে।

(খ) ইতিহাস কোন্ বিষয় সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ মিটাইতে পারে?

(গ) মানুষের ইতিহাসের মূল কথা বলিতে কি বোঝা যায়?

২। প্রাচীন যুগের কথা আমরা কয়েকটি উপাদান হইতে জানিতে পারি। এই উপাদানের তালিকা হইতে তোমার পছন্দ মত চারিটি উপাদান বাছিয়া লও।

———

২

আদিম যুগের মানুষ

মানুষের আবির্ভাব—পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে কবে আদিম যুগের মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সন তারিখের হিসাব মিলাইয়া তাহা বলা কঠিন। তবে মানুষের আগে পৃথিবীর বুকে অন্যান্য প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—একথা বলা যায়। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে কয়েক শ্রেণীর অতিকায় পশু যাহাদের অস্তিত্ব বহু দিন আগে লোপ পাইয়াছে। ইহাদের শারীরিক শক্তি কিংবা আয়তনের তুলনায় মানুষ ছিল দুর্বল ও খর্বাকৃতি। তবু এই সমস্ত অতিকায় প্রাণী শেষ পর্যন্ত তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই ; অথচ মানুষ শুধু বাঁচিয়াই নাই—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন জয় করিয়া মানুষ আজ লাভ করিয়াছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীর মর্যাদা।

কি ভাবে ইহা সম্ভব হইল ? ইহার জন্য দায়ী দু'টি কারণ। প্রথমত, অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের বুদ্ধি ছিল অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত, মানুষের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য। তাহার হাত দু'টির গঠন ছিল এমন ধরনের যে, সে ঐ দুটিকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করিতে পারিত। অন্যান্য প্রাণীরা এ বিষয়ে ছিল অসহায়। যে ধরনের প্রাণীরা শীতপ্রধান অঞ্চলে বসবাস করিতে অভ্যস্ত, তাহারা গরম আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত না। কিন্তু মানুষের দৈহিক গঠনের বিশেষত্ব এমনই ছিল যে শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান যে কোন অঞ্চলেই তাহার পক্ষে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলা অসম্ভব ছিল না।

আদিম মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি—আদিম যুগের মানুষের চেহারার সঙ্গে আজিকার মানুষের চেহারার মিল অবশ্য খুব বেশী একটা পাওয়া যায় না। বরং আকৃতির দিক হইতে আমাদের এই পূর্বপুরুষদের সহিত শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং, গোরিলা প্রভৃতি প্রাণীর মিল ছিল অনেক বেশী। সে-যুগের মানুষের

কপাল ছিল অত্যন্ত ছোট, জ্রর তলায় ছিল ঝোলানো উঁচু হাড়, চোয়াল প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। দেহের দৈর্ঘ্যও ছিল কম। মেরুদণ্ড সোজা করিয়া হাঁটাও তাহাদের পক্ষে ছিল কষ্টসাধ্য।

পিকিং মানব

নিয়াণ্ডেরথাল মানব

চীন, যবদ্বীপ, আফ্রিকা, জার্মানী, ইটালি, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে আদিম যুগের মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য জার্মানীর অন্তর্গত ডুসেলডর্ফের কাছে **নিয়াণ্ডেরথাল** নামে এক জায়গায় পাওয়া একটি মনুষ্যকঙ্কাল। পণ্ডিতদের অনুমান, আজ হইতে অন্ততঃ এক লক্ষ বছর আগে এই ধরনের মানুষ বিচরণ করিত পৃথিবীর বুকে। সম্ভবতঃ দলবদ্ধ হইয়া ইহারা লোমওয়ালা গণ্ডার প্রভৃতি অতিকায় প্রাণীদের শিকার করিত।

আগুনের ব্যবহার—যে সময়কার কথা বলা হইল তখন অবশ্য মানুষের জীবনযাপন প্রণালীতে ঘটিয়া গিয়াছে বিস্ময়কর পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল আগুনের আবিষ্কার। বনে জঙ্গলে কোন কোন সময় দাবানল দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়াছে, ছুটন্ত প্রাণীর ক্ষুরের ঘায়ে পাথরের বুকে আগুন ঠিকরানোও তাহাদের চোখে পড়িয়াছে।

কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আগুন জ্বালাইবার কৌশল তাহাদের জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই কৌশলটি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাহারা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। চীনের রাজধানী পিকিং-এর কাছে চুকোতিয়েন নামক স্থানে যে গুহায় আদিম যুগের মানুষের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই গুহার বাহিরের দিকে দেখা গিয়াছে আগুন জ্বালাইবার চিহ্ন। ইহাই আদিম মানুষের আগুন জ্বালাইবার প্রচেষ্টার সর্বাধিক প্রাচীন নমুনা। ইহা তিন লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ বৎসরের পুরানো। মনে হয় কাঠে কাঠ ঘষিয়া কিংবা পাথরের গায়ে ক্রমাগত পাথর ঠুকিয়া তখন এই আগুন জ্বালানো হইত। কিন্তু যে প্রণালীতেই আগুন জ্বালানো হোক না কেন, আগুনের ব্যবহার সভ্যতার পথে মানুষের প্রথম সার্থক পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এখন হইতে আর হিংস্র প্রাণীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে গাছের ডালে অথবা কোটরে আত্মগোপন করিতে হইত না। সমতল জায়গায় চলাফেরার ফলে তাহার দেহও ক্রমশঃ সোজা হইয়া উঠিল। গুহার মুখে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া তাহারা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিত। আগুনের সাহায্যে প্রচণ্ড শীতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াও সহজসাধ্য হইল। শীতের ভয়ে যে সব অঞ্চল এতদিন তাহারা এড়াইয়া চলিত সে সব অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পক্ষে তাহাদের কাছে আর কোন বাধা রহিল না। ক্রমশঃ তাহারা মাছ বা মাংস আগুনে ঝলসাইয়া কিম্বা শাকসব্জী আগুনে সিদ্ধ করিয়া খাইতে শিখিল এবং ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

খাদ্য-সংগ্রাহক—আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করার পরেও বহুদিন পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ চাষ-আবাদের কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তখনও তাহারা গাছের ফলমূল, শাকসব্জী কিংবা মাছ-মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

॥ ক ॥ পুরানো প্রস্তরযুগ

পাথুরে যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার এবং তাহাদের ব্যবহার—সভ্যতর জীবন যাপনের পথে মানুষের অগ্রগতি ঘটিয়াছে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করিয়া। পণ্ডিতেরা এই সকল স্তরকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরকে বলা হয় **পুরানো প্রস্তর যুগ**। এই যুগের মানুষ ব্যবহার করিত পাথর দিয়া তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি। বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির গভীর স্তরে এই ধরনের পাথুরে হাতিয়ার
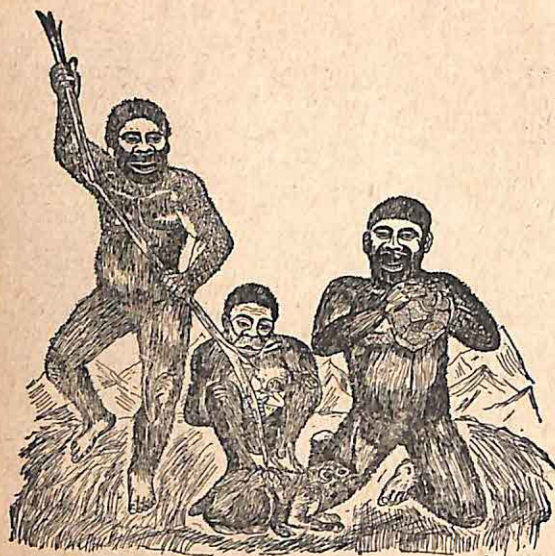
আদিম যুগের হাতিয়ার—পাথর আর গাছের ডাল

পাওয়া গিয়াছে। আত্মরক্ষা এবং শিকারের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করার
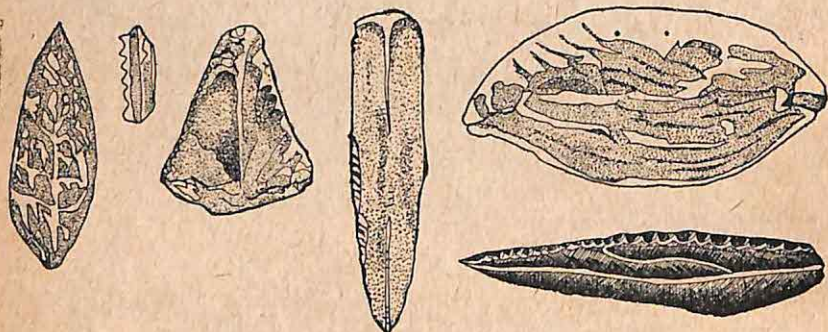
চকমকি পাথরে গড়া কয়েকটি হাতিয়ার

উদ্দেশ্যে এই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী ও ব্যবহার করা হইত। এগুলি ছিল সাদামাটা ধরনের ও অমসৃণ। ভারী পাথুরে হাতুড়ির ঘায়ে ভাঙ্গিয়া পাথরের

টুকরা দিয়া তৈয়ারী করা হইত ছুরি এবং কুঠার জাতীয় অস্ত্র, বর্শার অগ্রভাগ, গদা ইত্যাদি। এই সকল হাতিয়ার কাছাকাছি জায়গা হইতে ব্যবহার করিতে হইত। সুতরাং এই ধরনের হাতিয়ার ব্যবহারের জন্য দৈহিক বল এবং মনের সাহস দু'য়েরই প্রয়োজন ছিল বেশী।

পাথরের কুড়াল

জীবনধারা—এই যুগের মানুষ কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিত না। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করার কৌশল ও তাহাদের ভালো ভাবে জানা ছিল না। খাদ্যের সন্ধানে তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইত, কারণ খাদ্য সংগ্রহই ছিল তাহাদের একমাত্র বৃত্তি। কৃষি, পশুপালন অথবা খাদ্য উৎপাদন রীতির সঙ্গে তাহাদের কোনই পরিচয় ছিল না। ধাতুর ব্যবহারও ছিল তাহাদের কাছে অজানা।
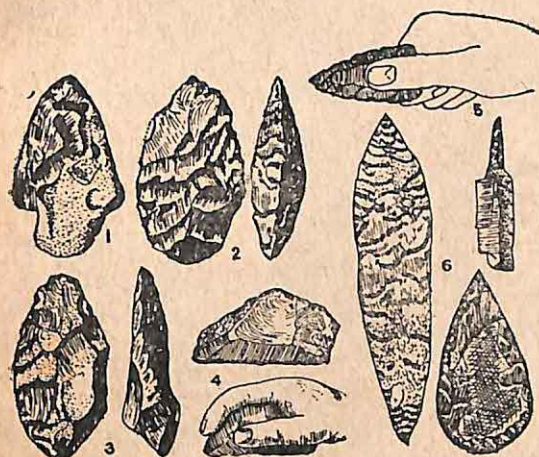
পুরাতন প্রস্তর যুগের কয়েকটি যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্রের নমুনা

এই যুগের যে-সকল প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল দাঁতওয়ালা বাঘ, লোমওয়ালা হাতী এবং গণ্ডার।

ভারতে প্রাপ্ত নিদর্শন—ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাওয়া পুরানো প্রস্তর যুগের নিদর্শন সংখ্যায় কম। অবশ্য পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট, মধ্যভারত,

কর্ণাটক, দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের কোন কোন অঞ্চল হইতে এই যুগের কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, পাথরে তৈয়ারী বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি।

॥ খ ॥ নূতন প্রস্তর যুগ

যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের উন্নতি—পুরাতন প্রস্তর যুগের অবসানে শুরু হয় নূতন প্রস্তর যুগ। মনে হয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এই রূপান্তরের প্রস্তুতি। নূতন যুগের যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে সংখ্যার দিক হইতে সর্বাধিক হইল পাথুরে হাতিয়ার ও
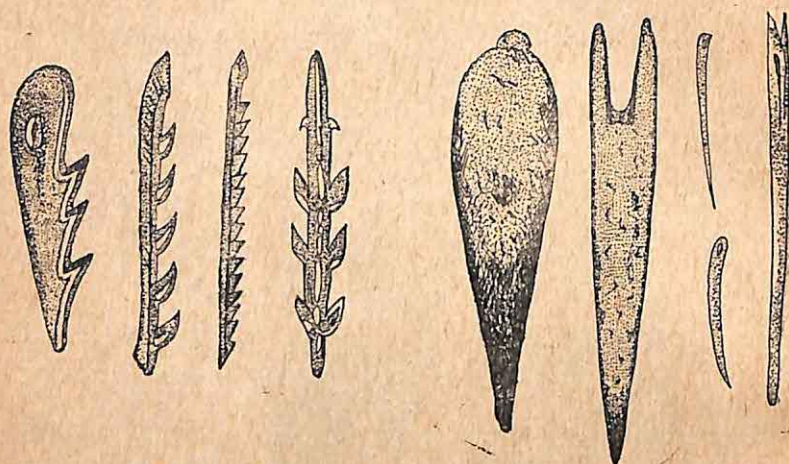
হাড়ের তৈরী হার্পুন   হাড়ের সূচ জাতীয় যন্ত্র ও অস্ত্র

যন্ত্রপাতি। আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির সন তারিখ সম্পর্কে কোন নির্ভুল তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে প্রস্তরযুগের একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উন্নীত হওয়ার মধ্যে ছিল কয়েক হাজার বৎসরের ব্যবধান। এই সব হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন ধরনের পাত্র আগের যুগের তুলনায় ছিল সুদৃশ্য এবং মসৃণ। কোন কোনটির গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে সূক্ষ্ম কারুকার্যের রেখা। দূর হইতে নিক্ষেপ করা যায় এই রকমের বর্শার ফলক, তীর প্রভৃতি এই যুগের মানুষ ব্যবহার করিত। নানা ধরনের পাথর ছাড়া, হাড় শিং এবং কাঠের সাহায্যেও যন্ত্রপাতি তৈয়ারী

করা হইত। এ-সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ধারালো ছুরি, চেরার যন্ত্র, কাস্তের ফলক, কাঁটাযুক্ত তীরের মুখ, কোঁচ (হার্পুন), ঘটিবাটি এবং ছোটখাটো যন্ত্রপাতি। এইসব আবিষ্কারের ফলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন আগের তুলনায় কম শ্রমসাধ্য এবং সহজ হইয়া আসে। শারীরিক বল অপেক্ষা মাথার বুদ্ধি যে বেশী কার্যকরী—ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারার ফলে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অনেকখানি অগ্রসর হওয়ার সাহস ও সুযোগ পাইল।

কৃষিকৌশল আবিষ্কার—আগুন জ্বালাইবার কৌশল আয়ত্ত করার পর আরও একটি নূতন কৌশল মানুষের করায়ত্ত হইল—ইহার ফলে সভ্যতর জীবন যাপনের পথে তাহারা অগ্রসর হইয়া গেল আরও এক ধাপ। এই কৌশলটি হইল চাষ-আবাদের উপায়। এতোদিন তাহারা জীবন ধারণ করিয়াছে শুধু মাছ-মাংস, ফলমূল খাইয়া। প্রকৃতির কাছ হইতে যাহা পাওয়া যাইত তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকা ছাড়া মানুষের এতদিন উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদে মানুষ একদিন আবিষ্কার করিল কৃষির কৌশল। প্রাচীন যুগের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে তখনকার মানুষের তৈয়ারী কাঠের লাঙ্গল এবং নিড়ানী যন্ত্র।

খাদ্য-সংগ্রাহক হইতে খাদ্য-উৎপাদকের স্তরে উন্নয়ন—জমিতে কি ভাবে ফসল ফলানো সম্ভব তাহা জানার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় দেখা গেল বিরাট পরিবর্তন। খাদ্যের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি না করিয়া এক জায়গায় মোটামুটি স্থায়ী ভাবে থাকা তাহাদের পক্ষে এবার হইতে সম্ভব হইল। ইতিপূর্বে দলবদ্ধ হইয়া থাকার যে প্রবণতা আদিম যুগের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়াছিল এবার তাহা আরও দৃঢ় হওয়ার ফলে গোষ্ঠী অথবা পরিবার গঠনের পথ সুগম হইয়া উঠিল। ইহার ফলে গড়িয়া উঠিল যৌথ সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের রীতি।

ওদিকে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল পশুপালনের প্রয়োজন। ইহার ফলে হিংস্র পশুদের বাদ দিয়া গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট, কুকুর প্রভৃতি প্রাণী স্থান পাইল গৃহপালিত পশুর তালিকায়।

ভারতবর্ষে কাশ্মীর, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যভারত, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে নূতন প্রস্তর যুগের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সংখ্যার দিক হইতে এগুলি নগণ্য ; কিন্তু ইহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের আদিম যুগের মানুষ যখন বহু সংগ্রাম ও উদ্যোগের মধ্য দিয়া সভ্যতর জীবনযাত্রার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল তখন ভারতবর্ষও সেই উদ্যোগের সামিল হইয়াছিল—আবিষ্কৃত নূতন প্রস্তর যুগের নিদর্শন হইতে এই কথাটি আমরা জানিতে পারি।

॥ গ ॥ উন্নততর জীবনযাত্রার সন্ধানে মানুষ

নূতন প্রস্তর যুগের মানুষ শুধু মসৃণ ধরনের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কৌশল আয়ত্ত করিয়া কিংবা আগুন ও কৃষির সহিত পরিচিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই। মানুষের মনে রহিয়াছে অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহল, পরিবেশকে নিজের উপযোগী করিয়া উন্নততর জীবন গড়িয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা। তাই মানুষের গতিপথ কোন একটি জায়গায় থামিয়া যায় নাই।

পশুপালন—প্রথমে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের, বিশেষতঃ হিংস্র প্রাণীদের ভয়ে এড়াইয়া চলিত। কিছুদিনের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে নিজেকে বলীয়ান করিয়া তুলিয়া মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মুখোমুখি হইতে শিখিল। ক্রমে মানুষ বুঝিতে পারিল যে প্রাণীকে শুধু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিলে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না ; হিংস্র নয় এইরূপ প্রাণীদের সহযোগিতা পাইলে তাহার পক্ষে পরিবেশকে জয় করা সহজতর হইবে। এই ধারণার বশীভূত হইয়া মানুষ কতকগুলি শ্রেণীর প্রাণীকে গৃহপালিত প্রাণীরূপে ব্যবহার করিতে শিখিল। ইতিপূর্বে এই সব গৃহপালিত পশুর কথা বলা হইয়াছে। এই ভাবে কিছুকালের মধ্যেই গড়িয়া উঠিল মানুষ ও নির্দিষ্ট শ্রেণীর পশুদের লইয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নূতন সমাজ। এই সমাজে মানুষের ছিল প্রভুর ভূমিকা। পশুরা শুধু তাহাদের হুকুম তামিল করিয়া চলিত। চাষ-আবাদের কাজে, বন্য পশু শিকারে এবং জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াতে এবং ঘরবাড়ী, ক্ষেতজমি পাহারা দেওয়ার কাজে গৃহ-

পালিত পশুদের ভূমিকা ছিল রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী মানুষকে যোগায় পুষ্টিকর পানীয়—দুধ। তাই এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রাণীদের সম্পর্কে মানুষ ছিল সর্বাপক্ষা বেশী যত্নশীল।

চাকার আবিষ্কার: পোড়ামাটির বাসনপত্র ও অন্যান্য জিনিস উৎপাদন—সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়াছে নূতন ধরনের আরও একটি আবিষ্কার। এতদিন মানুষ শুধু পাথর, হাড়, কিংবা কাঠ দিয়া তৈয়ারী করিত তাহার নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী—হাতিয়ার, ঘটিবাটি, বাসনপত্র। এবার মানুষের করায়ত্ত হইল আরও একটি নূতন কৌশল। হয়তো অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবেই এই কৌশলটির আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল। জ্বলন্ত আগুনের মধ্য হইতে একদিন অকারণে ফেলিয়া দেওয়া কোন একটি মাটির ঢেলা যখন কঠিন আকার ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখনই মানুষ বুঝিতে পারিল এই পদ্ধতিটিকে কাজে লাগাইতে পারিলে তাহার জীবনধারণের প্রণালী আরও সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিবে। এই ভাবে মানুষ মাটি পোড়ানো সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে গিয়া পোড়া মাটির সাহায্যে তৈয়ারী করিতে শিখিল নানা ধরনের পাত্র—থালা, বাসন, ঘটি, বাটি, গ্লাস। প্রয়োজন বোধ হইতেই সম্ভব হয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃতি (Necessity is the mother of invention)—এই প্রবাদবাক্যটি সফল হইল যখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিল কুমোরের চাকা। এই চাকার সাহায্যে নরম মাটির তালকে রূপান্তরিত করা হইল বিভিন্ন আকারের পাত্রে—কলসী, ঘটি, বাটি, কুঁজো, থালা ইত্যাদিতে। প্রথমে এই ধরনের পাত্র মসৃণভাবে তৈয়ারী হইত না। পরে উন্নততর কৌশলের সাহায্যে মাটির তৈয়ারী মসৃণ পাত্রের গায়ে ফুটাইয়া তোলা হইত নানা ধরনের সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকার্য। এই কাজে দৈহিক শক্তির তেমন প্রয়োজন হইত না। তাই আদিম যুগে স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ এই কাজ করিতেন।

কুমোরের চাকা—প্রাচীন গ্রীস

পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী—আদিম যুগের প্রথম পর্বে মানুষ শীত বা রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মরা প্রাণীর ছাল দিয়া তৈয়ারী করিত তাহাদের পোষাক। ক্রমে আরও সহজতর উপায়ে কি ভাবে গা ঢাকা দেওয়া যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করিতে গিয়া মানুষ শর, নলখাগড়া অথবা গাছের তন্তুর সাহায্যে পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিতে শিখিল। আরও পরে নূতন প্রস্তর যুগে আবিষ্কৃত হইল পশুর লোম দিয়া পোষাক তৈয়ারীর কৌশল। এছাড়া তিসি গাছের ছাল হইতে সূতা বাহির করিয়া বস্ত্র তৈয়ারীর পদ্ধতিও এই যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তন্তু বা সূতা বুনিবার কৌশল আয়ত্ত করার ফলে অদূর-ভবিষ্যতে কার্পাস ও রেশম হইতে বস্ত্র তৈয়ারী সহজসাধ্য হইয়াছিল।

স্থায়ী আবাস নির্মাণ—আমরা দেখিয়াছি আদিম যুগে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মতোই পাহাড়ের গুহায় অথবা গাছের কোটরে বসবাস করিত। তাহার নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। যাযাবরের মতো এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ানোই ছিল তাহার স্বভাব। তারপর নূতন প্রস্তর যুগে মানুষ যখন কৃষির কৌশল আয়ত্ত করে তখন হইতে খাদ্যের সন্ধানে তাহার আর এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন রহিল না। চাষ-আবাদের জন্য জমিতে জল দেওয়া, বীজ বপন, চারা গাছ দেখা-শোনা করা, যথাসময়ে ফসল তোলা ইত্যাদি কাজে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই একটানা একই জায়গায় না থাকিলে এই সব কাজের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হইবে না—ইহা চিন্তা করিয়া মানুষ স্থায়ী ভাবে একই জায়গায় বাস করিতে শুরু করিল; বিশেষতঃ নদীর ধারে—যেখানে জলসেচ, মাছ ধরা আর ফসল ফলানোর কাজ ছিল সহজ। ইহার ফলে তাহারা গাছ, পাতা

নতুন প্রস্তর যুগের শিকারী ও ঘরবাড়ী

কাঠ, খড় দিয়া তৈয়ারী করিতে শিখিল ঘরবাড়ী। অবশ্য সব দেশেই একই ধরনের বাড়ীঘর তৈয়ারী হইত না। সব দেশে একই রকমের জলবায়ু কিংবা উপকরণ পাওয়া যাইত না। তাই বাড়ীঘরের চেহারাও সর্বত্র এক রকম ছিল না। কোন কোন অঞ্চলে ৫ হইতে ৬ ফুট জায়গা জুড়িয়া মাটিতে গভীর গর্ত খোঁড়া হইত। তারপর খড় কিংবা শুকনো লতাপাতা দিয়া তাহা ঢাকিয়া দেওয়া হইত। পরে চারিদিক ঘিরিয়া তৈয়ারী করা হইত কাঠের গুঁড়ির দেওয়াল। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন কোন অঞ্চলে নদী অথবা হ্রদের ধারে যেখানে জলের গভীরতা কম সেই সব জায়গায় কাঠের গুঁড়ি পুঁতিয়া তাহার উপর পাটাতন দিয়া ঘর তৈয়ারী করা হইত। চারকোণা এইসব বাড়ীর দৈর্ঘ্য হইত ২০ হইতে ২৫ ফুট পর্যন্ত। কোন কোন বাড়ীতে আলাদা আলাদা কক্ষ থাকিত এবং এক পাশে গৃহপালিত
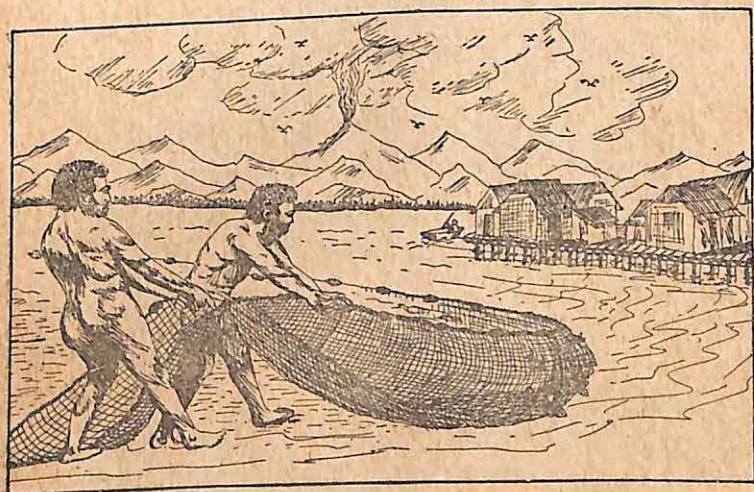
আদিম যুগের মাছ শিকার—দূরে হ্রদের উপর নির্মিত ঘরবাড়ী

পশুর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পাথর গাঁথিয়া পাকা বাড়ীও তৈয়ারী হইত। যে ধরনের বাড়ীই হোক না কেন, প্রতিটি বাড়ীর চারিপাশ ঘিরিয়া দেওয়া হইত উঁচু দেওয়াল।

যানবাহন—স্থায়ী ভাবে এক জায়গায় বসবাস করার ফলে অনবরত এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন আর ছিল না। কিন্তু স্থায়ী ভাবে এক জায়গায় থাকার পর হইতে নূতন করিয়া দেখা দিল যানবাহনের প্রয়োজন। ঘরবাড়ী তৈয়ারীর উপকরণ যোগাড় করা, ফসল সংগ্রহ করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য বসতি অঞ্চলে লইয়া যাওয়া অথবা জিনিসপত্রের বিনিময়ের জন্য যানবাহনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হইত গৃহপালিত পশুদের। গরু, গাধা, উটের পিঠে চড়িয়া স্থলপথে আর পর পর কাঠের গুঁড়ি সাজাইয়া তৈরী ভেলায় জলপথে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত সম্ভব হইত। আরও পরে চাকার সাহায্যে তৈয়ারী হইল গাড়ী। বলদ কিংবা মহিষ-টানা এই ধরনের গাড়ী প্রস্তর যুগ হইতেই চালু হইয়াছিল।

সমাজবদ্ধ জীবন—আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে নূতন প্রস্তর যুগ হইতেই সমাজ জীবন গড়িয়া তুলিতে মানুষ উদ্যোগী হইয়াছিল। একদিকে
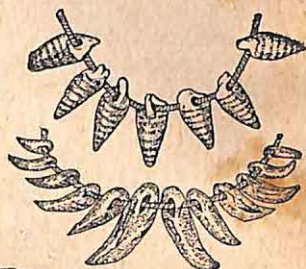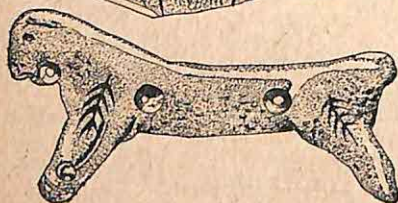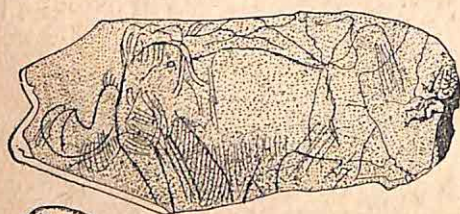
উপরে ঃ অতিকায় হাতীর দাঁত
নীচে ঃ মৃত বন্য হরিণের সাহায্য তৈরী জন্তুর প্রতিকৃতি

উপরে ঃ পশুর দাঁতের তৈরী গলার অলঙ্কার
নীচে ঃ নূতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

অন্যান্য প্রাণী অপর দিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে প্রয়োজন ছিল সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগের। তাই এক অঞ্চলের বাসিন্দারা নিজ

নিজ বৃত্তি অনুযায়ী ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী পোড়ামাটির কাজ করিত, কোন গোষ্ঠীর কাজ ছিল বস্ত্রের যোগান দেওয়া, কেহ কেহ বা নিজেদের পরিচয় দিত শিকারী রূপে।

ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পসৌন্দর্যবোধ—এতক্ষণ আমরা প্রস্তর যুগের মানুষদের জীবনযাত্রার কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মানুষ—যে কোন যুগের লোকই হোক না কেন—শুধুমাত্র জীবনধারণের চিন্তাই করে নাই। তাহার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে নানা ধরনের বিশ্বাস এবং রুচিবোধ। সে যুগের মানুষ বিশ্বাস করিত যে মৃত্যু জীবনের উপর পুরোপুরি ছেদ টানিতে পারে না। তাই কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি জীবিতকালে যাহা ব্যবহার করিত, যেমন শস্যের দানা, হাতিয়ার, অলঙ্কার ইত্যাদি, মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হইত। সে যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবত্ব আরোপের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম যুগে মানুষের ভক্তির প্রধান পাত্র ছিলেন সূর্যদেবতা। পরের যুগে প্রধান উপাস্যা ছিলেন শস্যের দেবী।

ভাষার উদ্ভব—আদিম যুগের গোড়ায় মানুষ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করিত। পরে যখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একই জায়গায় বসবাস করিতে শুরু করে তখন তাহারা পরস্পরের কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করিল। আদি যুগে কোন ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যেমন অগ্নিকাণ্ড, কিংবা ভূমিকম্প, অথবা বজ্রপাত হইলে তাহারা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিত। আবার সুন্দর মনোরম কোন কিছু দেখিলে তাহাদের গলা দিয়া বাহির হইত একরকমের অস্ফুট আওয়াজ। ক্রমে তাহারা আয়ত্ত করিল মনের কোন একটি বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করার জন্য জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত বিশেষ শব্দ। ক্রমে মানব-সমাজে ঘটিল ভাষার উৎপত্তি।

চিত্রশিল্প—নূতন প্রস্তর যুগের অধিবাসীরা চিত্রশিল্পে অসাধারণ

দক্ষতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। ছবিগুলি এমন আশ্চর্য নিপুণভাবে

নূতন প্রস্তর যুগের মানুষ চিত্রশিল্পেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। উত্তর স্পেনের অলটামিরার গুহার গায়ে দেখিতে পাওয়া যায় বাইসন, বরাহ, ঘোড়া, ষাড়, হরিণ প্রভৃতির রঙীন চিত্র। আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে আঁকা যে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

আদিম যুগের গুহাচিত্রের শিল্পী

আঁকা যে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। গুহার মুখ হইতে অনেকখানি দূরে দেওয়ালের গায়ে অন্ধকারে কি ভাবে এই সব সূক্ষ্ম ছবি আঁকা হইয়াছিল

অল্টামিরার গুহাচিত্র—বরাহ

তাহা ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয়। খুব সম্ভব, শিল্পীরা চর্বি দিয়া তৈয়ারী দীপের আলোকে ছবি আঁকিত।

অনুশীলন

১। একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে হিংস্র অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম আদিম যুগের মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে মানুষ। তাহার এই সাফল্যের মূলে ছিল দৈহিক গঠন এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ। উন্নততর জীবনযাপনের পথে মানুষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল একদিকে আগুন, অপরদিকে কৃষি-কৌশলের আবিষ্কার।

২। পুরানো প্রস্তর যুগের মানুষরা কি ধরনের জীবন যাপন করিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সেই যুগের ব্যবহৃত পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র হইতে। এই সময় মানুষ যাপন করিত যাযাবর জীবন।

৩। নূতন প্রস্তর যুগে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীতে দেখা গেল উল্লেখযোগ্য উন্নতি। এই যুগের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র আগের যুগের তুলনায় ছিল সূক্ষ্মতর এবং মসৃণ। এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি কৃষির আবিষ্কার। ইহার ফলে মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া একই অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে শিখিল।

৪। উন্নততর জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশুপালন করিতে শিখিল। চাকার সাহায্যে মাটি পোড়াইয়া প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র তৈয়ারীর কৌশল আয়ত্ত করিল। গাছের ছাল অথবা পশুর লোম দিয়া তাহারা আবিষ্কার করিল পোষাক তৈয়ারীর কৌশল। এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আয়ত্ত করিল বাড়ীঘর তৈয়ারীর পদ্ধতি।

৫। বহুকাল পর্যন্ত পশুপালন, পশু শিকার, চাষাবাদ মানুষের প্রধান বৃত্তিরূপে গণ্য হইত। একই অঞ্চলে একসঙ্গে বসবাস করার ফলে তাহাদের মধ্যে ক্রমে গড়িয়া উঠিল সমাজজীবন। এই সমাজের ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া।

৬। আদিম যুগের শেষের দিকে মানুষের মনে দেখা দিল ধর্মবিশ্বাস। প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মানুষ ভয় ও ভক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করিতে শিখিল দেবত্ব।

৭। সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের ফলে মানুষ পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে শিখিল—ইহার ফলে ভাষার সৃষ্টি হইল। সেই সঙ্গে মানুষের মনে দেখা দিল সৌন্দর্যবোধ। প্রাচীন যুগের মানুষ গুহার গায়ে যে সমস্ত প্রাণীর ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে চিত্রশিল্প হিসাবে তাহাদের মূল্য সকলেই স্বীকার করেন।

প্রশ্নমালা

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) পৃথিবীতে যে সকল প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্যে মানুষ কি সর্বপ্রথম প্রাণী ?

(খ) মানুষের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীতে কি ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ?

(গ) প্রাচীন প্রাণীদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই। কিন্তু মানুষ শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখে নাই; প্রতিযোগিতায় মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের হার মানাইয়াছে। ইহা কিভাবে সম্ভব হইল ?

২। আদিম যুগের মানুষের আকৃতি কিরূপ ছিল ?

৩। পুরানো প্রস্তর যুগের কয়েকটি হাতিয়ারের ছবি সংগ্রহ করিয়া একটি অ্যালবাম তৈয়ারী কর।

৪। অ্যালবামের একটি পাতা জুড়িয়া নূতন প্রস্তর যুগের কয়েকটি হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির ছবি সাজাও।

৫। পুরানো এবং নূতন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রায় কি পার্থক্য দেখা যায় ?

৬। সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতি কি কি আবিষ্কার অবলম্বন করিয়া সম্ভব হইয়াছিল ?

৭। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ?

৮। (ক) প্রাচীন যুগের ঘরবাড়ী কিরূপ ছিল ?

(খ) অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রাচীন যুগের শিল্পীরা কি উপায়ে ছবি আঁকিতেন ?

(গ) সভ্যতর জীবন যাপনের পথে আগুনের ব্যবহার এবং কৃষির আবিষ্কারের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

———

৩

ধাতু যুগ
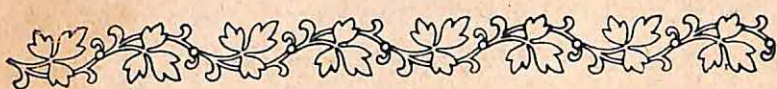
প্রস্তর-যুগের শেষে যে নূতন যুগের শুরু হয় সে যুগের মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছিল। এই যুগকে বলা হয় তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ। মাটি খুঁড়িয়া এই যুগের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে একদিকে তামা, অন্য দিকে তামা, টিন ও দস্তা মিশাইয়া মিশ্র ধাতুতে (ব্রোঞ্জ) তৈয়ারী নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন। নূতন প্রস্তর যুগের সকল চিহ্ন অবশ্য তখনও লোপ পায় নাই। এই কারণে মনে হয় যে প্রস্তর যুগ হইতে ধাতু-যুগে বিবর্তন সম্পূর্ণ হইতে কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল। পৃথিবীর সকল দেশে একই সঙ্গে ধাতুর ব্যবহারের প্রচলন ঘটে নাই। কোন কোন অঞ্চলে যখন ধাতুর ব্যবহার ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল তখনও অপর কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা পুরানো পদ্ধতি অনুসারে পাথুরে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সাহায্যেই তাহাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটাইয়া চলিতেছিল।

নগরের উৎপত্তি—এই নূতন যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—নগর বা শহরের উত্থান। এতদিন পর্যন্ত কৃষিজীবী মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হইয়া বসবাস করিত গ্রামাঞ্চলে, বিশেষতঃ নদী বা হ্রদের ধারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাহারা ছড়াইয়া পড়িল নানা দিকে। আগুনের সাহায্যে জঙ্গল পুড়াইয়া তাহারা গড়িয়া তুলিল নূতন নূতন বসতি। যে-সব অঞ্চলে চাষ-আবাদ হইত না সেখানেও এবার হইতে শুরু হইল চাষ-আবাদ। ফলে একদিকে জনসংখ্যা অপর দিকে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সে-যুগের মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিল নূতন নূতন সমস্যা। এই পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষ অনুভব করিল আরও সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের প্রয়োজন। ইহার ফলে গড়িয়া উঠিল নূতন নূতন বসতি অঞ্চল। যে-সব অঞ্চলে শীত গ্রীষ্ম দু'য়েরই তীব্রতা কম, যেখান হইতে অন্যত্র যাতায়াত সহজসাধ্য, যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কম, যে জায়গার কাছাকাছি অঞ্চল হইতে খাদ্য এবং পানীয় সহজেই সংগ্রহ করা যায়—সেই সব অঞ্চলে গড়িয়া

উঠিল ঘন বসতি বা জনপদ। পল্লী অঞ্চলে চাষ-আবাদ হইত। সেখানে থাকিত পশুচারণের ক্ষেত্র বা তৃণভূমি। কিন্তু নূতন বসতি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিল নগর বা শহর। বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোকের সমাবেশে এই সকল নগর ক্রমশঃ অগ্রসর হইল সমৃদ্ধির পথে।

উৎপাদনক্ষেত্রে পরিবর্তন—এই যুগে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। কৃষির ব্যাপক প্রচলনের ফলে নতুন কয়েকটি শ্রেণী এবং বৃত্তি গড়িয়া উঠিল। জমিতে জলসেচ, বীজ বপন এবং শস্য সংগ্রহ করার পরেও ফসল বণ্টন বা বিনিময় করার প্রয়োজন দেখা দিল। উৎপাদন পদ্ধতিতেও ক্রমশঃ দেখা গেল উন্নতির লক্ষণ। ধাতুর ব্যাপক প্রচলনের ফলে বহু লোক গ্রহণ করিল ধাতুশিল্পীর বৃত্তি। তাহাদের প্রয়োজন হইল একদিকে উপকরণ সংগ্রহ, অপরদিকে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা। কম সময়ে অধিক উৎপাদন কি করিয়া সম্ভব—এই বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল। ফলে উৎপাদন এবং চাহিদার মাত্রা দুইই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বিশেষীকরণ—প্রথম যুগে যে কেহ যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে প্রত্যেক বৃত্তিধারী ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা থাকা এবং প্রয়োগকৌশল জানা দরকার। ইহার জন্য প্রয়োজন শিক্ষানবিশী এবং বিশেষ ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা। ইহার ফলে সমাজে দেখা গেল বিশেষ বৃত্তিধারী কতকগুলি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য—উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সমস্যা দেখা দিল। একটি বিশেষ অঞ্চলের চাহিদা মিটাইবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহার জন্য প্রয়োজন হইল বিক্রয়ের ব্যবস্থা। তাছাড়া কোন অঞ্চলই স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল না। এক অঞ্চল যাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত, অপর অঞ্চলে ছিল তাহার ঘাটতি। এছাড়া যাহারা যাহা উৎপাদন করিত শুধু মাত্র সেই বিশেষ উৎপন্ন বস্তুতে তাহাদের সকল প্রয়োজন মিটিত না। যেমন, যে ধাতুশিল্পী, তাহার প্রয়োজন হইত শস্যের। এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া সেই যুগের মানুষ আবিষ্কার করিল বিনিময়-প্রথা। শস্যের পরিবর্তে

বস্ত্র, বস্ত্রের পরিবর্তে হাতিয়ার, হাতিয়ারের পরিবর্তে থালাবাসন ইত্যাদি দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে ধাতুযুগের মানুষের প্রয়োজন মোটামুটি ভাবে মিটানো হইত।

সামাজিক জীবনে পরিবর্তন—নূতন নূতন বৃত্তির উদ্ভবের প্রভাব সমাজ জীবনেও অনুভূত হইল। একই বৃত্তিধারী লোকেরা ক্রমে গড়িয়া তুলিতে লাগিল এক একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। এই ভাবে সে-যুগের সমাজে অনেকগুলি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষিজীবি, ক্ষেতের শ্রমিক, তন্তুবায়, কামার, কুমোর, শিকারী, চিত্রশিল্পী, পুরোহিত, পশুপালক এবং যোদ্ধা। সাধারণতঃ প্রত্যেক গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে থাকিতেন এক একজন গোষ্ঠীপতি।

দলীয় সংঘর্ষ—স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত নূতন সমাজের লোকেরা সর্বদা শান্তিতে অথবা নিরুপদ্রবে বসবাস করিত এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। নানা স্বার্থের বিরোধ লইয়া কোন এক অঞ্চলের বাসিন্দাদের সহিত অপর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কখনও কখনও কলহ বিবাদ হইত। আবার একই অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও অন্তর্বিবাদ ঘটিতে দেখা যাইত। ফলে যে দলনেতার নেতৃত্বে যে গোষ্ঠী বিজয়ী হইত সেই দলনেতা এবং সেই গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর স্থাপন করিত নিজেদের কর্তৃত্ব। এই ভাবে সামরিক অথবা সাংগঠনিক বলে অধিক বলীয়ান দলনেতা প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য দলকে পরাজিত করিয়া তাহার নিজের এবং গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সুযোগ পাইত। ইহার ফলে বিজয়ী দলনেতা বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য শুধুমাত্র নিজের দল বা গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না। অন্যান্য গোষ্ঠীও তাহার কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইত।

রাষ্ট্রচেতনার বিকাশ—এই ভাবে শক্তিবৃদ্ধির ফলে সমাজ একদিকে যেমন ঐক্যবদ্ধতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিল, তেমনই দেখা গেল দলনেতার হাতে অধিক হইতে অধিকতর ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। এই পরিস্থিতির ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইল তাহার প্রভাবে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীভূত শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রের উত্থানের পথ সুগম হইয়াছিল।

নদী-উপত্যকায় মানব-সভ্যতা বিকাশের কারণ—ধাতুযুগের সমাজ বিবর্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার।

নূতন এই সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হিসাবে আমরা উল্লেখ করিয়া থাকি মিশর, মেসোপোটেমিয়া, ভারতবর্ষের সিন্ধু-বিধৌত অঞ্চল, চীন, এবং ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ঈজিয়ান দ্বীপাঞ্চলের নাম। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কোন আকস্মিক কারণে এই সব অঞ্চল প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি রূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল ইহাদের ভৌগোলিক অবস্থান। প্রাচীন সভ্যতার এইসব পীঠস্থানের প্রত্যেকটি (ঈজিয়ান দ্বীপাঞ্চল ছাড়া) অবস্থিত ছিল নদনদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। মিশরে নীলনদী, মেসোপোটেমিয়ায় ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, ভারতে সিন্ধুনদ, চীনে হোয়াং হো এবং ইয়াংসি কিয়াঙ এই সব অঞ্চলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক হইয়াছিল। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা সহজসাধ্য ; সুতরাং এখানে কৃষি সম্পদ সহজেই বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া নদীপথে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় জিনিসপত্রের চলাচল সহজ। উপকরণ সংগ্রহ এবং জিনিসপত্রের আদানপ্রদানের সমস্যা এই সব অঞ্চলে সহজেই সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইত। নদীতীরবর্তী এই সকল দেশে জলবায়ুর তীব্রতাও ছিল কম। এখানকার বাসিন্দাদের জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশই শুধু সহজলভ্য ছিল না, জীবনসংগ্রামের তীব্রতা কম ছিল, অবসরও ছিল প্রচুর। ইহার ফলে এখানকার অধিবাসীরা জীবনধারণের জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার পর ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও গভীর ভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাইত। এই সব কারণেই নদীমাতৃক এই সব অঞ্চল সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি কেন্দ্ররূপে।

অনুশীলন

১। প্রস্তর যুগের তুলনায় ধাতু যুগ মানুষকে পৌঁছাইয়া দিল উন্নতির পথে আরও কয়েক ধাপ উঁচুতে। নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার তৈয়ারী হওয়ার ফলে দেখা গেল নূতন নূতন বৃত্তিধারী সম্প্রদায়। ফলে একদিকে যেমন বাড়িয়া গেল উৎপাদনের মাত্রা, অপরদিকে তেমনই বৃদ্ধি পাইল বৃত্তিধারীদের সংখ্যা।

২। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের বাণিজ্য। ইহার ফলে সমাজে দেখা দিল অর্থবলে বলীয়ান নূতন

বণিকশ্রেণী। তাছাড়া সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার ফলে ছোট ছোট সমাজ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া উঠিল বৃহত্তর সমাজ। কালক্রমে বৃহত্তর সমাজ হইতে ঘটিল রাষ্ট্রের উদ্ভব।

৬। প্রাচীন যুগে সভ্যতার আদিভূমিরূপে যে কয়েকটি অঞ্চল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহাদের সবকটিই অবস্থিত ছিল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অথবা সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বীপাঞ্চলে। ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এই সব অঞ্চলে খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা, জলবায়ু, যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা এখানকার বাসিন্দাদের জীবনে আনিয়া দেয় সচ্ছলতা এবং অবসর। জীবনধারণের সংগ্রাম এখানে কঠোর ছিল না। অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় এখানকার মানুষ সভ্যতর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রশ্নমালা

১। প্রাচীন যুগে মানুষ কিভাবে লোহার ব্যবহার আয়ত্ত করে?

২। প্রাচীন যুগের এক শ্রেণীর মানুষ কিভাবে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বসবাস শুরু করে?

৩। (ক) নীচে বিভিন্ন যুগের তালিকা দেওয়া হইল; সময়সীমা অনুসারে পর পর সাজাইয়া এই তালিকাটি সংশোধন কর—নূতন প্রস্তর যুগ, ধাতুর যুগ, পুরাতন প্রস্তর যুগ, লোহার যুগ।

(খ) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কি কারণে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল? সভ্যতার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের অন্ততঃ তিনটি নদ বা নদীর নাম লিখ।

---

৪ মানব সভ্যতার আদি কেন্দ্র

একই সময়ে যেমন পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের আবির্ভাব ঘটে নাই তেমনই সব দেশে একসঙ্গে সভ্যতার বিকাশও ঘটে নাই। মোটামুটি ভাবে সারা পৃথিবীর বেশীর ভাগ অঞ্চল জুড়িয়া সভ্যতার বিকাশ ঘটিতে বহু শতাব্দী কাল লাগিয়াছিল। মানব-সভ্যতার আদি কেন্দ্ররূপে প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলের নাম উল্লেখ করা হয়—মেসোপোটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা এবং চীন।

॥ ক ॥ মেসোপোটেমিয়া

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব—এই চারিটি অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীনতম কেন্দ্র মেসোপোটেমিয়া। মেসোপোটেমিয়া বলিতে আমরা বুঝি ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস এই নদী দুটির মধ্যে অবস্থিত জনপদ। আসলে 'মেসোপোটেমিয়া' কথাটির অর্থ হইল দু'টি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই নামকরণ গ্রীকদের।

জমির উর্বরতা—পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত এই অঞ্চলটি ছিল খুবই উর্বর। উত্তরের আর্মেনিয়া পর্বতমালার শিখর হইতে বরফ গলার সময় নদী দুটির জল ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিত। দুই কূল ছাপাইয়া জলের ধারা প্লাবিত করিত বিরাট অঞ্চল। তারপর যখন জল নামিয়া যাইত তখন প্লাবিত অঞ্চল জুড়িয়া দেখা যাইত শুধু পলিমাটি। এই পলিমাটিতে একদিকে যেমন সহজেই চাষ-আবাদ হইত, অপর দিকে এগুলি রোদের তাপে শুকাইয়া অথবা আগুনে পুড়াইয়া তৈয়ারী হইত ইট। কোন এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে হইলে দুটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন—প্রথমে খাদ্য ও পানীয়; দ্বিতীয়তঃ বাসগৃহ তৈয়ারীর উপকরণ। এ দুটিই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত মেসোপোটেনিয়া অঞ্চলে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই খুব প্রাচীনকাল হইতে এখানে গড়িয়া উঠিয়াছিল জনবসতি।

মিশরের সভ্যতা
সিন্ধু সভ্যতা
মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা
চীনের সভ্যতা
টাইগ্রিস
ইউফ্রেটিস
নীল
সিন্ধু
হোয়াংহো
ইয়াংসিকিয়াং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
চীন সাগর

সভ্যতার আদিভূমি
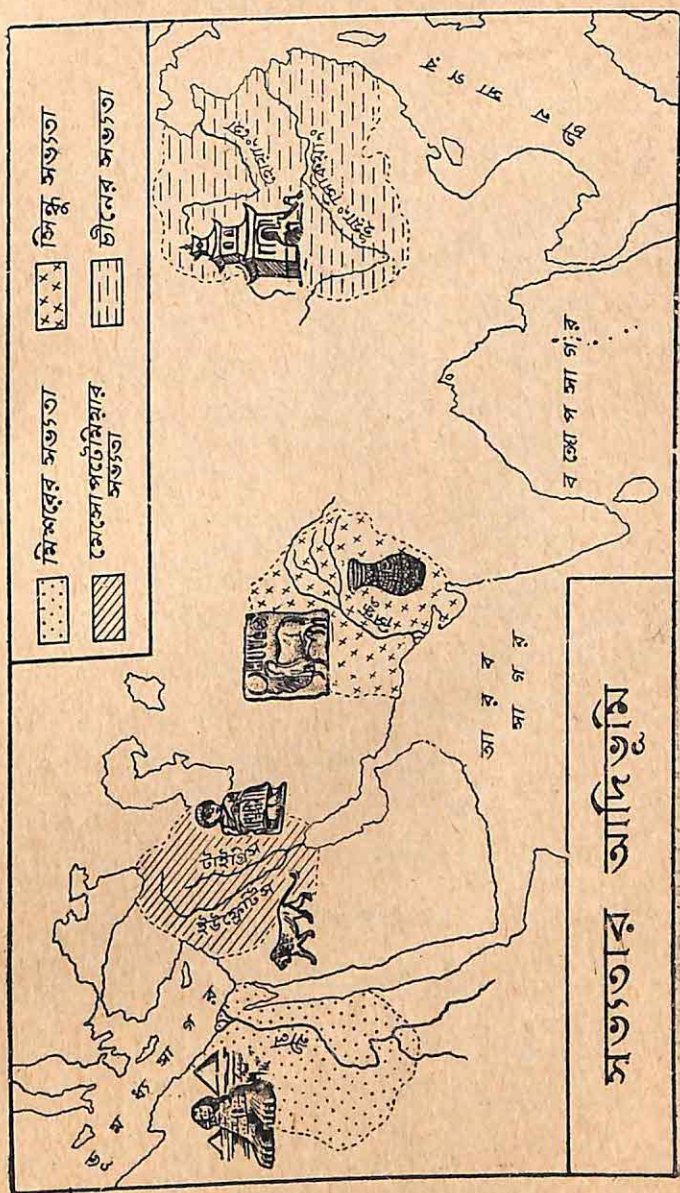
সুমের জাতির কৃতিত্ব—প্রথমে এখানকার বসবাসকারী হিসাবে যাহাদের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের বলা হইত সুমের জাতির মানুষ। নরম মাটির গায়ে ত্রিকোণাকৃতি কীলক দিয়া রেখার সাহায্যে ইহারা আঁকিত মন্দির, ঘরবাড়ী, নগরের নক্সা, মানচিত্র, আইনকানুন, হিসাবপত্র, দলিল দস্তাবেজ। কাগজ অথবা পশুর শুকনো চামড়ার পরিবর্তে ইহারা লিখিত মাটির ফলকে। পণ্ডিতদের ভাষায় এ ধরনের ত্রিকোণাকৃতি কীলকের সাহায্যে লেখাকে বলা হয় cuneiform লিপি।

শহর ও মন্দির নির্মাণ—সুমেরদের এক প্রাচীন শহরে নিপ্‌পুর। এই অঞ্চলের মাটির তলায় যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৫ হইতে ৬ হাজার বছর আগেকার। এই শহরে অবস্থিত ছিল বায়ুদেবতা এন্‌লিল-এর বিশাল দুর্গ মন্দির। এই অঞ্চলে পাথর বা কাঠ সহজে পাওয়া যাইত না। এই কারণে ঘরবাড়ী, মন্দির তৈয়ারীর জন্য ইহারা ব্যবহার করিত রোদে শুকানো মাটির ইট। পরে ইহারা মাটির ইটকে আগুনে শক্ত করার কৌশল আয়ত্ত করে।
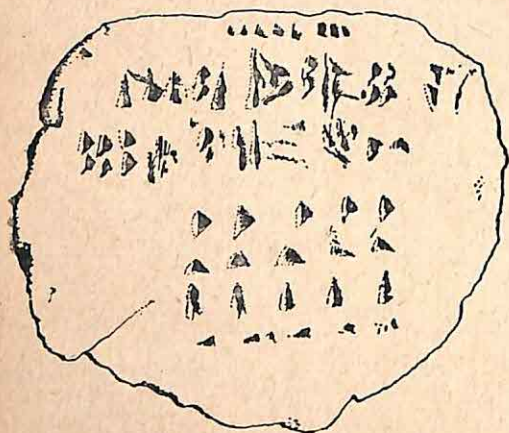
সুমের-এর কিউনিফর্ম লিপির নিদর্শন

শাসনব্যবস্থা—সুমের জাতি যে অঞ্চলটিতে বসবাস করিত তাহা ছিল কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রের সমষ্টি। এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এই সকল রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব ছিল পুরোহিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হাতে। ইহাদের মধ্যে যিনি হইতেন সর্বাধিক শক্তিশালী কালক্রমে তিনিই পরিচালনা করিতেন সর্বোচ্চ শাসন-ক্ষমতা। এই ভাবে প্রতিটি রাষ্ট্রের নায়ক পরিচিত হইলেন রাজা নামে।

অনেক সময় পুরোহিত ও রাজা ছিলেন অভিন্ন। মাঝে মাঝে এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের বিরোধ বাধিত। অনেক সময় যুদ্ধও হইত। কিন্তু মোটামুটি ভাবে পার্শ্ববর্তী মরু অঞ্চলের দস্যুদের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য ইহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেই অভ্যস্ত ছিল।

সুমের-এর পুরোহিত

বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ—এখানকার মাটিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত। নদী হইতে জল সরবরাহ ছিল খুব সহজ। বর্ষার শেষে জল নামিয়া যাওয়ার পর যে সব নিচু জায়গায় জল জমিয়া থাকিত তাহার চারিপাশে বাঁধের সাহায্যে লোকেরা সারা বছরের জন্য জল সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তাই কোন সময়েই জলের অভাব ঘটিত না। অল্প পরিশ্রমে এখানে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইত তাহা হইতে তাহাদের সারা বছরের প্রয়োজন মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিত। এই কারণে সুমেরদের জীবন-যাত্রায় ছিল প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য। যব এবং গম ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্যশস্য।

নিপ্‌পুর ছাড়া এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উর, কিস, লাগাস এবং এরিদু।

ধাতুশিল্প—সুমেররা শুধু কৃষিজীবীই ছিল না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ধাতুশিল্পী। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর সাহায্যে ইহারা তৈয়ারী করিত নানা ধরনের অলঙ্কার। তাছাড়া ছিল বণিক সম্প্রদায়। উদ্বৃত্ত শস্য এবং বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ছিল তাহাদের ব্যবসায়। সুমেরদের সমাজে দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত শ্রেণী ছিলেন বিশেষ সম্মানের অধিকারী। যোদ্ধাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল পদাতিক। বর্শা এবং কুঠার ছিল

ইহাদের প্রধান হাতিয়ার। আত্মরক্ষার জন্য ইহারা তামার টুপি ও ঢাল ব্যবহার করিত। সেনাপতিরা রথে চড়িয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন।
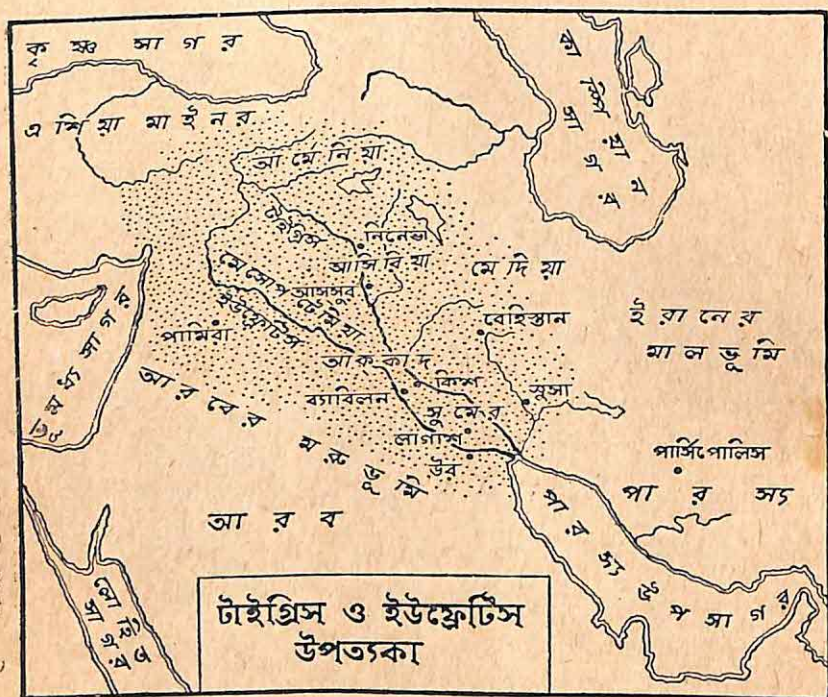
মন্দির নির্মাণ—সুমেরদের প্রধান কীর্তি তাহাদের দুর্গমন্দির। প্রথমে ইটের পর ইট সাজাইয়া তৈয়ারী করা হইত উঁচু ঢিবি; তারপর ঢিবির উপর তৈয়ারী হইত মূল মন্দির। উর শহরের মন্দিরটি ছিল ৭০ ফিট উঁচু। মন্দিরের চারিপাশ ঘিরিয়া থাকিত পুরোহিতদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরবাড়ী। কোনো কোনো বাড়ীঘরে দেখা যাইত ছোটখাটো কারখানা অথবা ব্যবসায়ের ঘাঁটি। এইভাবে এক একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিত নগর-জীবন। রোদে পোড়ানো ইটের সাহায্যে যে সব মন্দির নির্মিত হইত তাহাদের দেওয়ালে অনেক সময় দেখা যাইত দেবদেবী, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের নানা রঙিন চিত্র। মন্দিরগুলির গায়ে আঁকা থাকিত সুন্দর কারুকার্য।

সুমেররা ঘরবাড়ী মন্দির ছাড়া তৈয়ারী করিত নানা ধরনের মূর্তি এবং অস্ত্রশস্ত্র। এই যুগে লোহার ব্যবহার ব্যাপক না হইলেও অজানা ছিল না। মেসোপোটেমিয়ার মাটির তলা হইতে যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে কিছু কিছু লোহার হাতিয়ার এবং কৃষির যন্ত্রপাতি।

যানবাহন—যাতায়াতের জন্য গাধা, ঘোড়া এবং গরুটানা গাড়ী ব্যবহার করা হইত। জলপথে যাতায়াতের বাহন ছিল কাঠের নৌকা। **ব্যবসায়-বাণিজ্য** ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শস্য, গরু, ভেড়া ছাড়া মেসোপোটেমিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হইত পশমী বস্ত্র।

লিপি—মেসোপোটেমিয়ায় কি ভাবে মাটির ফলকে লেখা হইত তা' আগে বলা হইয়াছে। লিপিকাররা প্রথমে ছবির সাহায্যে নরম মাটির গায়ে আঁচড় কাটিয়া তাঁহাদের বক্তব্য ফুটাইয়া তুলিতেন। সম্পূর্ণ ছবির বদলে তাঁহারা আঁকিতেন প্রথমে ছবির কোন একটি বিশেষ অংশ বা প্রতীক। এই সকল অংশ ব্যবহৃত হইত সাঙ্কেতিক চিহ্ন রূপে। সুমেররা বর্ণমালার ব্যবহার জানিত না। মোটামুটি ৩৫০টি সঙ্কেতের সাহায্যে তাহাদের লেখার কাজ চলিত।

॥ খ ॥ মিশর

অবস্থান ও ভূমিভাগের প্রকৃতি—পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার আর একটি কেন্দ্র উত্তর আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত **মিশর দেশ**। মেসোপোটেমিয়ার ক্ষেত্রে যেমন ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, তেমনই মিশরের উন্নতির মূলে ছিল **নীলনদ**। শীত ও বসন্তকালে এই নদের জল থাকিত শান্ত, নিস্তরঙ্গ; কিন্তু বর্ষায় ইহার জলধারায় প্লাবিত হইত তীরবর্তী অঞ্চল। ইহার ফলে আশপাশের জমি হইয়া উঠিত অতিশয় উর্বর। প্লাবনের শেষে সামান্য চেষ্টায় এই জমিতে উৎপন্ন হইত প্রচুর ফসল। যে অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে থাকে প্রাচুর্য, সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধু অর্থনৈতিক দিক হইতেই উন্নত হয় না, তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানও হয় উন্নত ধরনের। প্রাচীন

সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে মিশরের খ্যাতির মূলে রহিয়াছে নীলনদের প্রভাব। তাই নদীটিকে বলা হয় **'মিশরের প্রাণ'**।
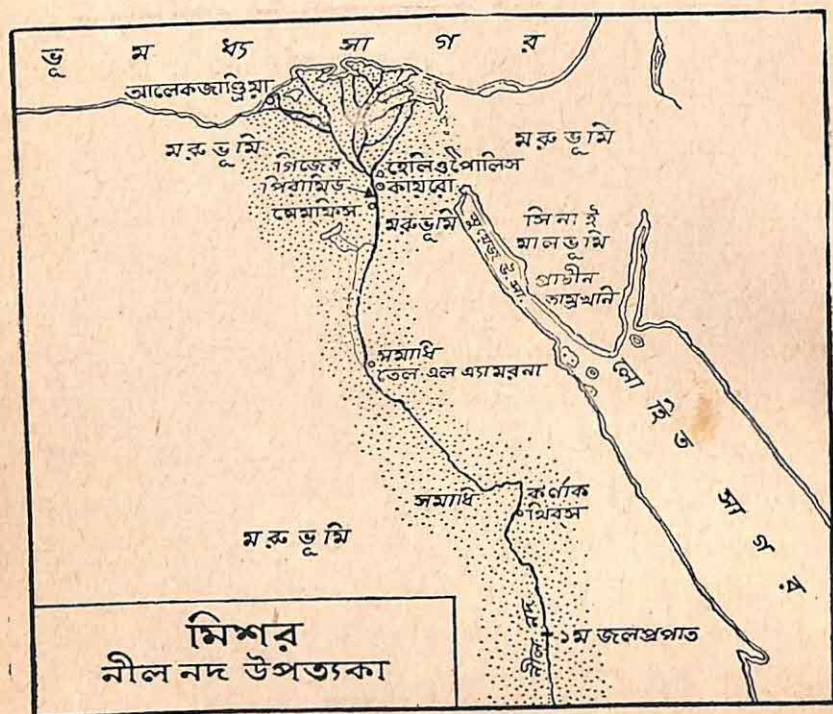
আফ্রিকা মহাদেশের বিরাট অংশ জুড়িয়া অবস্থিত রহিয়াছে আর যে সব অঞ্চল তাহাদের কোনটিই মিশরের মতো উর্বর নয়। বরং অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি। মিশরের এই স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতির দান। নীলনদ না থাকিলে মিশরকেও একদিন গ্রাস করিত মরুভূমি। কোন বৎসর যদি বৃষ্টিপাত কম হইত তাহা হইলে মিশর দেশে ঘটিত খাদ্যাভাব। সৌভাগ্যের বিষয় বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই এই অভাব ঘুচিয়া গিয়া উর্বর ভূখণ্ড জুড়িয়া দেখা যাইত প্রচুর খাদ্যশস্য।

সঙ্ঘবদ্ধ এবং উন্নততর জীবন যাপনের উপযোগী সব ক'টি উপাদান, যেমন জলের প্রাচুর্য, জমির উর্বরতা এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মিশরে

সহজলভ্য ছিল। যে কারণে মেসোপোটেমিয়ায় সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল সেই কারণে মিশরও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র রূপে।

মিশরের আদিম অধিবাসীরা প্রথমে বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া বসবাস করিত। চাষ-আবাদ, পশু এবং মাছ শিকার করিয়া ইহারা জীবনধারণ করিত। ইহাদের গৃহপালিত পশু বলিতে বুঝাইত গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণী। ক্রমে তাহারা বুঝিতে পারিল যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া থাকার পরিবর্তে যদি তাহারা একসঙ্গে বসবাস করিতে পারে তাহা হইলে প্রাকৃতিক শক্তিকে আরও বেশী মাত্রায় কাজে লাগানো, বন্যা প্রতিরোধ করা এবং নিশ্চিন্ততর জীবন যাপন সম্ভবপর ও সহজতর হইবে। তাই বিভিন্ন দল লইয়া ক্রমে গড়িয়া উঠিল কয়েকটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল মিশরের আদি সমাজ ও রাষ্ট্র।

ফেয়ারোর শাসন—ঐক্যের পথে অখণ্ড মিশরের সমাজ ও রাষ্ট্র যখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে সেই সময় রাষ্ট্রের প্রধানকে বলা হইত **ফেয়ারো**। প্রজাসাধারণের কাছে তিনি শুধু রাজাই ছিলেন না, তাহাদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতার প্রতিনিধি, এমন কি স্বয়ং দেবতা। সুতরাং বিনা প্রতিবাদে তাঁহার আদেশ মানিয়া চলাই ছিল প্রজাদের ধর্ম। প্রাচীন মিশরে অন্ততঃ ৩৩টি রাজবংশ বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা **মেনেস** (৩৪০০ খ্রীঃ পূঃ) দেশের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ তাঁহার শাসনাধীনে আনিয়া গোটা মিশর জুড়িয়া স্থাপন করিয়াছিলেন এক অখণ্ড রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল মেম্ফিস নগর। বহু বৎসর পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় থীব্‌স নগরে।

মিশরের রাজা ও রাণী

এ ধরনের লেখার জন্য প্রয়োজন হইত কুশলী লিপিকারের। সুতরাং প্রাচীন মিশরে লিপিকলার চর্চা হইত গভীর নিষ্ঠা লইয়া। লিপিকাররা রাজসভায় স্থান পাইতেন এবং সমাজে অধিষ্ঠিত ছিলেন মর্যাদার আসনে।

প্রাচীন মিশরের লিপি

রাজস্ব সংগ্রাহক—এ ছাড়া আরও একটি বিশেষ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল রাজস্ব সংগ্রহকারীদের লইয়া। প্রজাপালন যেমন রাজার কর্তব্য, তেমনি প্রজার দায়িত্ব ছিল নির্ধারিত হারে খাজনার যোগান দেওয়া। প্রজাদের নাম ধাম এবং বিষয় সম্পত্তির তালিকা থাকিত

প্রাচীন মিশরের মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত চিত্র

সরকারী দপ্তরে। তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল রাজস্ব সংগ্রহকারী নামে পরিচিত বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারীদের উপর। মিশরের শাসনব্যবস্থায় ইহাদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যোদ্ধশ্রেণী—ইহার পর ছিল যোদ্ধাদের দল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বাহিরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজার অধীনে থাকিত সৈন্যদল। সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা মিশরের যুবকদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেন। ইহারা অধিকাংশই

সমাজে পুরোহিতদের স্থান—ফেয়ারোর পরেই সমাজে ছিল পুরোহিতদের স্থান। প্রাচীন মিশরীরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবদেবী রূপে পূজা করিত। নীলনদ, সূর্য, বায়ু, বৃষ্টি সব কিছুতেই তাহারা আরোপ করিত দেবত্ব। তাহারা বিশ্বাস করিত যে মৃত্যুর পরেও আত্মা বাঁচিয়া থাকে। এই কারণে তাহাদের মধ্যে অনেক পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রচলন ছিল। পূজাপদ্ধতি ছিল জটিল। মন্দিরের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ইহার ফলে সমাজে পুরোহিত শ্রেণী বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন।

বর্ণমালা ও লিখন-পদ্ধতি—প্রাচীন মিশরেই সর্বপ্রথম বর্ণমালার প্রচলন হইয়াছিল। প্রথমে মিশরীরা মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীদের মতো ছবির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিত। পরে তাহারা আরও সংক্ষেপে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাগজের গায়ে ফুটাইয়া তুলিত তাহাদের বক্তব্য। তাহাদের বর্ণমালার সংখ্যা ছিল ২৪। নল-খাগড়ার তৈয়ারী কলম, প্যাপিরাস হইতে প্রস্তুত কাগজ আর জল, গঁদ এবং ঝুল মিশানো কালির সাহায্যে বর্ণমালা সাজাইয়া লেখার কৌশল সর্বপ্রথম মিশরেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্যাপিরাস গাছের ছাল এবং তন্তুগুলি পর পর সাজাইয়া আঠার সাহায্যে একসঙ্গে গাঁথিয়া রোদে শুকানো হইত। তারপর এগুলি ব্যবহার করা হইত লেখার সরঞ্জাম হিসাবে। এই সব লেখার বিষয়বস্তু ছিল সরকারী আদেশ, হিসাবপত্র, দলিল, নথি, বেসরকারী চিঠিপত্র, দেবদেবীদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্র, মন্ত্র ইত্যাদি।

রসেটা পাথরে উৎকীর্ণ প্রাচীন
মিশরের লেখার নমুনা

ছিল পদাতিক। কুঠার, বর্শা, ঢাল ছিল ইহাদের প্রধান হাতিয়ার। সৈনিক বৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে ছিল পুরুষানুক্রমিক। পদাতিক ছাড়া রথারোহী সৈন্যদলও ছিল মিশরের সামরিক বাহিনীর আর একটি অঙ্গ।

শ্রমজীবী শ্রেণী—পুরোহিত, রাজস্বসংগ্রহকারী এবং যোদ্ধৃদল ছাড়া ছিল শ্রমজীবী শ্রেণী। নীলনদের প্লাবন এড়াইবার জন্য প্রয়োজন দেখা দিত বাঁধ নির্মাণের। আবার বড় বড় মন্দির এবং সমাধি-সৌধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইত। নীলনদের জল খালের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্যও প্রয়োজন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতার। অনেক সময় যখন নদের তীরবর্তী অঞ্চল বন্যার জলে

মিশরীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পাত্র

ভাসিয়া যাইত তখন চাষ-আবাদ সম্ভব হইত না। যাহারা ক্ষেতে খামারে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত তাহাদের রোজগারের ব্যবস্থা না থাকিলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে—ইহা আশঙ্কা করিয়া মিশর সরকার নানাভাবে সাধারণ মানুষকে কাজকর্মে লিপ্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। পিরামিড নির্মাণ উপলক্ষে বহু লোকের কর্মসংস্থান হইত। বিনা পারিশ্রমিকেও একদল লোকের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হইত—ইহাদের বলা হইত দাস বা **ক্রীতদাস**।

অন্যান্য বৃত্তি—প্রাচীন মিশরের জনগণের অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী। কৃষি ছাড়াও জীবিকা অর্জনের অন্যান্য উপায় ছিল। এই যুগের শিল্পীরা—

কামার, কুমোর, ছুতোর, স্বর্ণশিল্পী, মৃৎশিল্পী, চর্মশিল্পী প্রভৃতি—সকলেই নিজ নিজ শিল্পের ক্ষেত্রে রাখিয়া গিয়াছেন অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর।
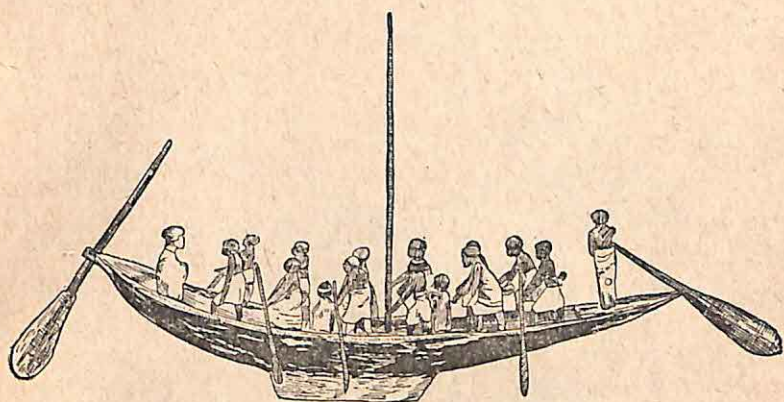
মিশরের কাঠের নৌকা

ব্যবসায়-বাণিজ্যও এই যুগে প্রসার লাভ করিয়াছিল। গাধার পিঠে বোঝা চাপাইয়া মিশরের বণিকরা সুদান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতি বৎসর তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। জলপথে তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ক্রীট, সাইপ্রাস এবং অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত। মিশরীরা আমদানি করিত প্রধানতঃ আবলুস কাঠ, হাতির দাঁত, উটপাখির পালক এবং সুগন্ধি গঁদ, মসলা, জাহাজ তৈয়ারীর উপকরণ এবং লোহা।

পিরামিড—প্রাচীন মিশরীদের এক অক্ষয় কীর্তি পিরামিড। পিরামিড বলিতে আমরা বুঝি পাথরে তৈয়ারী ত্রিকোণাকৃতি বিরাট সমাধি-সৌধ। প্রাচীন যুগের মিশরে এই বিশ্বাস সর্বত্র প্রচলিত ছিল যে মৃত্যুর পরেও আত্মার বিনাশ হয় না। মিশরীদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে মৃত্যুর পর আত্মা আবার দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তাহারা আরও বিশ্বাস করিত যে যতদিন দেহ অবিকৃত থাকিবে ততদিন দেহধারীর আত্মা স্বর্গলোকে সুখে অধিষ্ঠান করিবে। এই কারণে মৃত ব্যক্তির দেহ যাহাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য তাহারা বিশেষ যত্নবান

ছিল। তাহাদের চেষ্টায় মৃতদেহ দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হইতে পারে তাহার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। মৃতদেহে নানা ধরনের সুগন্ধি আরক ও মলম মাখাইয়া উহা স্থাপন করা হইত সমাধি-মন্দিরের নিরাপদ আশ্রয়ে। প্রথমে এই সব সমাধি-সৌধ তৈয়ারী হইত ইটের
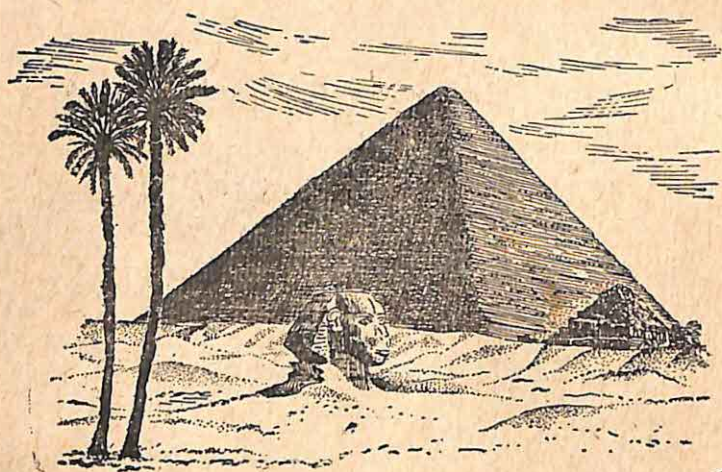
গিজের পিরামিড

সাহায্যে। পরে ইটের পরিবর্তে ব্যবহার করা হইত পাথর। ফেয়ারোদের সমাধির আকার ছিল বিশাল। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম ছিল গিজের পিরামিড। এটি ফেয়ারো খুফুর সমাধি। ১৩ একর পরিমিত জায়গা জুড়িয়া ৪৮১ ফিট উঁচু এই বিশাল সমাধি-সৌধটি নির্মাণ করিতে ২৩ লক্ষ পাথরের চাঁই লাগিয়াছিল—প্রত্যেকটির গড়পড়তা ওজন আড়াই টন। ২০ বছর ধরিয়া এক লক্ষ শ্রমিক ও কারিগরের সমবেত উদ্যোগে ইহার নির্মাণ সম্ভব হইয়াছিল। প্রতিটি সমাধিতে থাকিত একাধিক কক্ষ। মৃতদেহ শায়িত থাকিত মাটির তলায় অবস্থিত একটি কক্ষে। অন্য একটি কক্ষে মৃতের আত্মীয়স্বজনেরা মৃতের উদ্দেশে খাদ্য ও পানীয় রাখিয়া যাইতেন। কক্ষের দেয়ালে আঁকা থাকিত মৃতের ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামারের নানা ধরনের ছবি।

ধর্মবিশ্বাস—মিশরীরা বহু দেবদেবীর উপাসনা করিত। দেবদেবীরা অনেক সময় কোন জন্তু অথবা গাছ অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক বস্তুর রূপ ধারণ

করিতেন—এই বিশ্বাস মিশরীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহাদের উপাস্য অন্যতম প্রধান দেবতা আমনের প্রতীক ভেড়া। যে প্রাণীটিকে দেবতার মূর্তিরূপে গণ্য করা হইত তাহাকে বিশেষ যত্নের সহিত মন্দিরে পোষণ করা হইত। দেবতাদের উদ্দেশে নির্মিত হইত বহু মন্দির।

প্রধান প্রধান বৃত্তি—প্রাচীন মিশরের সমাজ ছিল প্রধানতঃ কৃষি-ভিত্তিক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে সকল শ্রেণীর মানুষ শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত না। একদিকে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, অপর দিকে রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের উপযোগী নূতন নূতন বৃত্তির উদ্ভব ঘটে। ফলে মিশরের সমাজে দেখা দেয় বহু ধরনের শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমজীবী। ইহাদের কথা আমরা আগে উল্লেখ করিয়াছি।

মিশরের ভাস্কর্যের নমুনা

॥ গ ॥ সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

আবিষ্কার ও প্রাচীনত্ব—প্রাচীন সভ্যতার আর একটি পীঠস্থান ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল। এ দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস যখন শুরু হয় তাহার বহু পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ঘটিয়াছিল এক সমৃদ্ধ সভ্যতার উত্থান। মাটির নীচের যে সকল স্তর হইতে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহা অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসরের পুরানো।

এই প্রাচীন সভ্যতাকে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আখ্যা দেওয়া হইলেও, সিন্ধু উপত্যকা অতিক্রম করিয়া উহা ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল অন্যান্য অঞ্চলেও।

উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্তান এবং পশ্চিমে কাথিয়াবাড় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদীর তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে ভারতের এই প্রাচীনতম সভ্যতার বহু চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল হরপ্পা, মোহেঞ্জদাড়ো,
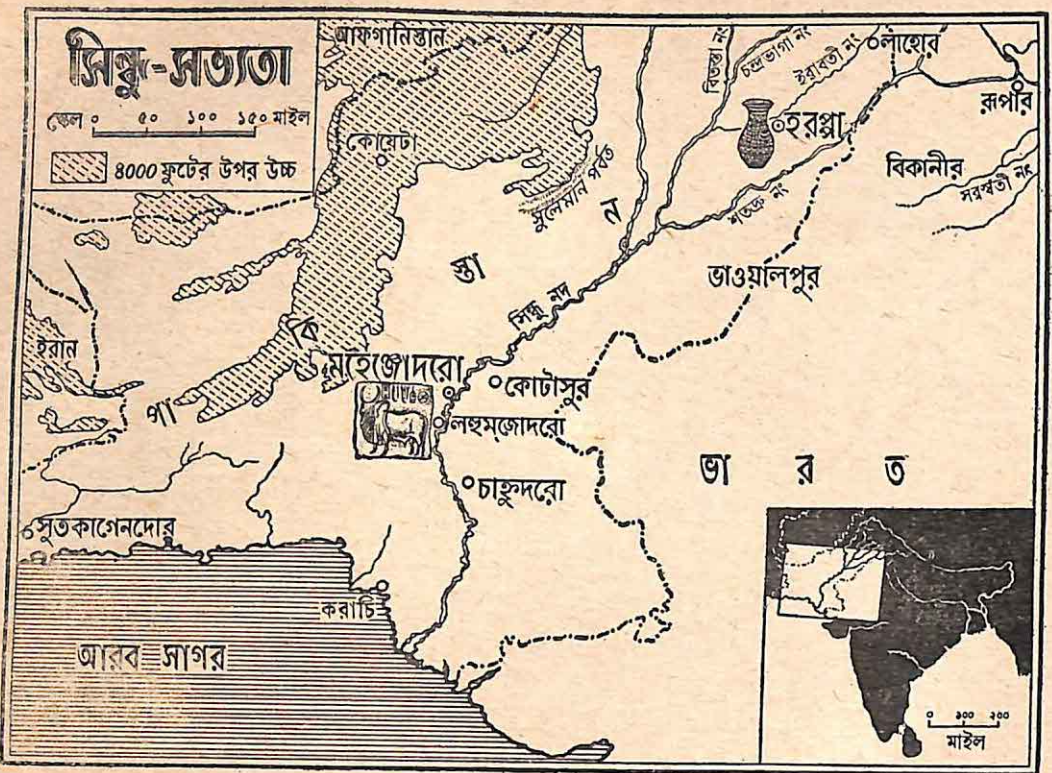
চান্হুদাড়ো, আমরি, সুতকাগেনদোর, রূপার, লোথাল, সোমনাথ এবং মেঘাম্। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে প্রথমোক্ত তুটি অঞ্চল। হরপ্পার

অবস্থান পাঞ্জাবে, মোহেঞ্জদাড়ো অবস্থিত সিন্ধুপ্রদেশে। 'মোহেঞ্জদাড়ো' কথাটির অর্থ 'মৃতের স্তূপ'।

মাটির গভীর স্তর খনন করিয়া যে সব চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সাহায্যে আমরা সেই ভুলিয়া-যাওয়া যুগের ছবি কল্পনা করিতে পারি। প্রাচীন যুগের এই সব চিহ্নগুলির মধ্যে রহিয়াছে অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, মূর্তি, খেলনা, চিরুনি, সীলমোহর, ঘরবাড়ী, শহরের বহু স্মৃতিচিহ্ন।

নগর পরিকল্পনা—পাঁচ হাজার বছর আগেকার সে-যুগের অধিবাসীরা মোটামুটি ভাবে আজিকার যুগের মানুষের মতোই জীবন যাপন করিত। তাহাদের ঘরবাড়ী ছিল পাকা, ইটের তৈয়ারী। কোন কোন বাড়ী ছিল দোতলা। উপরের তলায় বাস করিতেন বাড়ীর মালিক ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা। নীচের তলায় ছিল চাকরদের ঘর, রান্নার জায়গা ইত্যাদি। ধনীদের ঘরবাড়ীর আয়তন ছিল বেশ বড়। গরীব শ্রমজীবীরা বাস করিত ছোট ছোট ঘরে। বড়লোকদের বাড়ীতে থাকিত আধুনিক কালের বাড়ীর মতো প্রশস্ত দরজা, জানালা, উঠান, স্নানের জায়গা, ছাদ হইতে বৃষ্টির জল নিকাশের নর্দমা ইত্যাদি। মোহেঞ্জদাড়োতে একটি বড় আকারের স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এটি দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফিট। ইহার চারিপাশ ঘিরিয়া ছিল ৮ ফিট উঁচু পুরু দেয়াল। কাছাকাছি কোন কূপ হইতে সুড়ঙ্গপথে স্নানাগারের চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করা হইত। গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা এবং শীতকালে গরম জল দিয়া চৌবাচ্চা পূর্ণ করার বন্দোবস্তও ছিল। আধুনিক কালে স্নানাগারে যে ধরনের আরামদায়ক ব্যবস্থা থাকে, মোহেঞ্জদাড়োর পাঁচ হাজার বছর আগেকার এই স্নানাগারটিতে মোটামুটি সেই সকল ব্যবস্থাই ছিল।
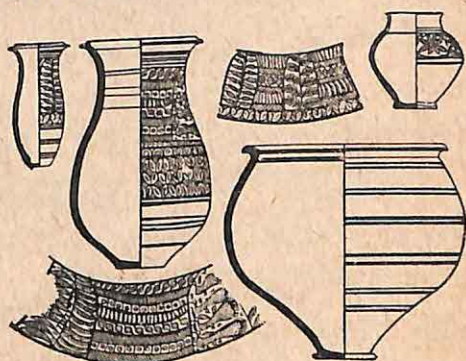
হরপ্পায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের পাত্র

শহরের পথঘাট ছিল বেশ চওড়া। রাস্তাঘাটে যাহাতে জল জমিতে না পারে সেজন্য পথের পাশেই থাকিত নর্দমা। রাস্তার দুই পাশে ছিল সারি সারি ঘরবাড়ী। রাস্তাঘাট, নর্দমা, ঘরবাড়ীর এই রকম সুন্দর পরিকল্পনা প্রাচীন যুগের ইতিহাসে বিরল।

খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহৃত জিনিসপত্র—মাটির তলদেশে এই যুগের কিছু কিছু প্রস্তরীভূত খাদ্যাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এই সকল চিহ্ন হইতে অনুমান করা যায় যে এই যুগের অধিবাসীদের খাদ্য ছিল যব, গম, মাছ, মাংস ও খেজুর। পানীয় হিসাবে ব্যবহার
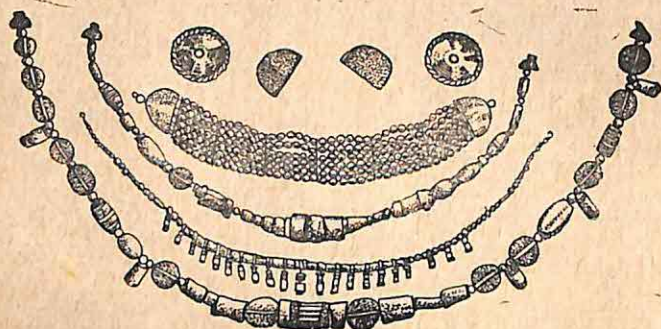
মোহেঞ্জদাড়োয় প্রাপ্ত অলঙ্কারের নিদর্শন

করা হইত দুধ। এখানকার প্রধান চাষ ছিল যব, গম ও কার্পাসের। চাষ-আবাদ ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যেও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা দক্ষ ছিল। তখনকার সমাজে কুমোর, তাঁতী, কামার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিধারী বহু লোক ছিল। কুমোররা চাকার সাহায্যে মাটির বাসনপত্র তৈয়ারী করিত। মাটি ছাড়া আর যে সকল ধাতুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র তৈয়ারী হইত তাহাদের মধ্যে ছিল তামা, ব্রোঞ্জ, চীনামাটি ও রূপা। বাসনপত্র ছাড়া অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আয়না, চিরুনি, সূচ, ঝাঁটা, দা, ক্ষুর এবং নানা ধরনের পুতুল ও খেলনা। সে যুগের তামা, সীসা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্র ও বাসনপত্রের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

শিল্প—হাতির দাঁত, চীনামাটি, শাঁখ, ঝিনুকে প্রস্তুত বহু সৌখিন জিনিসও তাহারা ব্যবহার করিত। সোনা, রূপা এবং দামী পাথরে তৈয়ারী অলঙ্কার তাহাদের প্রিয় ছিল। মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের মধ্যেই অলঙ্কার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সে যুগের যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কুঠার, গদা, ছোরা ও বর্শা। তরোয়ালের ব্যবহার বোধহয় তাহাদের জানা ছিল না।

ব্যবসায়-বাণিজ্য—বাণিজ্য বিষয়েও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের উদ্যোগের অভাব ছিল না। দেশে যাহা উৎপন্ন হইত দেশের লোকের প্রয়োজন মিটাইয়া তাহার উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে চালান করা হইত। খুব সম্ভব সিন্ধু উপত্যকার সহিত পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যের আদান-প্রদান ছিল। ভারতীয় বণিকরা বিদেশে মালপত্র পাঠাইবার সময় মোড়কের উপর সীলমোহরের ছাপ লাগাইতেন। বিদেশ হইতে যে সব দ্রব্য আমদানি করা হইত তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তামা, টিন ও দামী পাথর। স্থল ও জল দু'পথেই বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত।

সীলমোহর (মোহেঞ্জদাড়ো)

ধর্মবিশ্বাস—সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ধর্মজীবন সম্পর্কেও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মোহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পায় যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে দেবমন্দির বলিয়া মনে হইতে পারে এই ধরনের কোন কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে অনেকের ধারণা সে-যুগে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার পূজার প্রচলন ছিল না ; তবে মনে হয়, এই যুগে শিব ও শক্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল। মোহেঞ্জদাড়োতে একটি দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি এক ধ্যানমগ্ন যোগী পুরুষের। তাহার তিনটি মুখ, মাথায় তিনটি শৃঙ্গ। মূর্তিটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে হাতি, বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, হরিণ—এই পাঁচটি পশু। এই মূর্তিটি সম্ভবত পরবর্তী যুগের শিবমূর্তির

আদি রূপ। শক্তি রূপে তাহাদের প্রধান উপাস্য ছিলেন জগদম্বা। ইহা ছাড়া পশুদের মধ্যে ষাঁড় এবং গাছের মধ্যে অশ্বত্থকে তাহারা উপাস্য বলিয়া মনে করিত।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ—সিন্ধুসভ্যতার যে সব স্মারক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সাহায্যে তখনকার সমাজ কি কি শ্রেণী লইয়া গঠিত
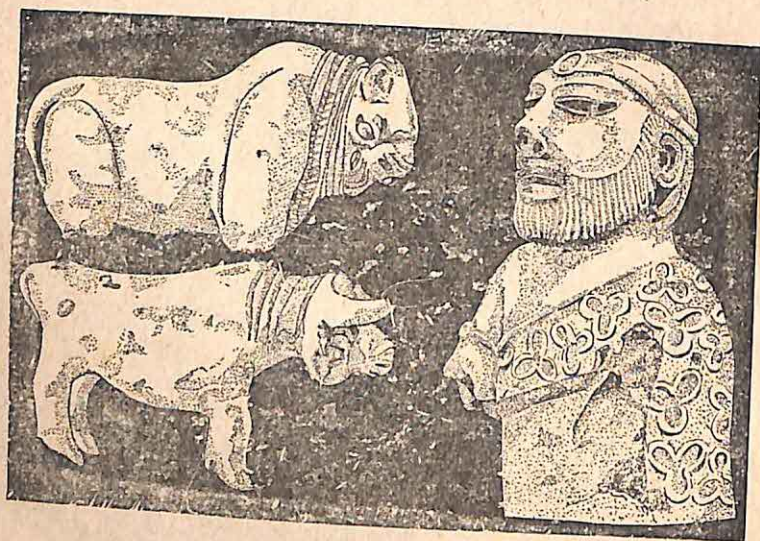
পোড়ামাটির ষাঁড় ও মহিষ এবং পাথরের পুরুষমূর্তি (মোহেঞ্জদাড়ো)

ছিল তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানে। কৃষিজমির মালিকানা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল ইহাদের অর্থাগমের প্রধান উপায়। পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। থাকিলেও সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তি ছিল না। বণিক ও ব্যবসায়ীরা ছাড়া সমাজের অন্যান্য শ্রেণী গঠিত হইত বিভিন্ন বৃত্তিধারী নানা শ্রেণীর কারিগর ও শ্রমজীবীদের লইয়া। বিনা মজুরীতে বেগার প্রথার প্রচলন হয়তো ছিল, কিন্তু দাস প্রথা তখনও গড়িয়া উঠে নাই।

॥ ঘ ॥ চীনের সভ্যতা

নদীর প্রভাব—মিশরের ক্ষেত্রে যেমন নীলনদ, মেসোপোটেমিয়ায় যেমন টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন সিন্ধুনদ, চীনদেশের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির মূলে তেমনই রহিয়াছে হোয়াং হো (অথবা পীত নদী) এবং ইয়াংসি কিয়াঙ এই নদী দু'টির প্রভাব। চীনের উত্তরাঞ্চলের এবং মধ্য-চীনের সীমান্ত ঘিরিয়া এই দুই নদীর বিরাট জলধারা প্রবহমান। হোয়াং-হো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যাহারা বসবাস করিত, তাহারা অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেক আগেই কৃষিজীবীরূপে একই জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাসে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার হাজার বৎসর পরে চীনের বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠে ছোট ছোট শহর। এগুলির চারিদিক ঘিরিয়া ছিল পাথুরে দেওয়াল।

কিংবদন্তীর প্রাচীন চীন—চীনদেশের কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর আগে এই দেশে দেখা দিয়াছিল এক সমৃদ্ধ সভ্যতা। চীনের অধিবাসীদের মতে এই যুগটি ছিল চীন সভ্যতার স্বর্ণযুগ। এই কিংবদন্তীর সপক্ষে খুব জোরালো প্রমাণ পাওয়া না গেলেও খ্রীষ্টের আবির্ভাবের অন্ততঃ এক হাজার বৎসর আগেও এখানকার অধিবাসীরা সভ্যতার দিক হইতে উন্নত ছিল—এ দাবী অবশ্যই করা যায়। এই সভ্যতার স্রষ্টা চীনদেশের আদিম বাসিন্দারাই, ইহারা জাতিতে মঙ্গোলীয়। বাহিরের কোন জাতি বা দেশের সহিত এই সভ্যতার কোন সম্পর্ক ছিল না।

মিশরের মতো চীনদেশ জুড়িয়া ছিল অনেকগুলি ছোট ছোট জনপদ। মিশরের মতো চীনদেশেও ছবির সাহায্যে লেখার কাজ চলিত। কাঠ অথবা বাঁশের পাতলা স্তরের উপর বাঁশের কলমের সাহায্যে আঁচড় কাটিয়া চীন-দেশের লোকেরা চিঠিপত্র, দলিল, পুঁথি ইত্যাদি লিখিত। পর পর দশটি বাঁশের পাতা লেখা হওয়ার পর তাহার মধ্যে ফুটা করিয়া চামড়া দিয়া বাঁধানোর পর শুরু হইত নূতন লেখা। এই ভাবে পাতার পর পাতা সাজাইয়া লেখা হইত বিরাট বিরাট পুঁথি।

ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন—চীনদেশের আয়তন বিরাট। সাঁইত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার বর্গ মাইল জুড়িয়া ইহার অবস্থান। এই প্রকাণ্ড দেশটিকে অনায়াসে বলা যায় একটি মহাদেশ। এই বিরাট আকারের দেশটির কোন স্থানে শীতের প্রকোপ, কোন অঞ্চলে গ্রীষ্মের
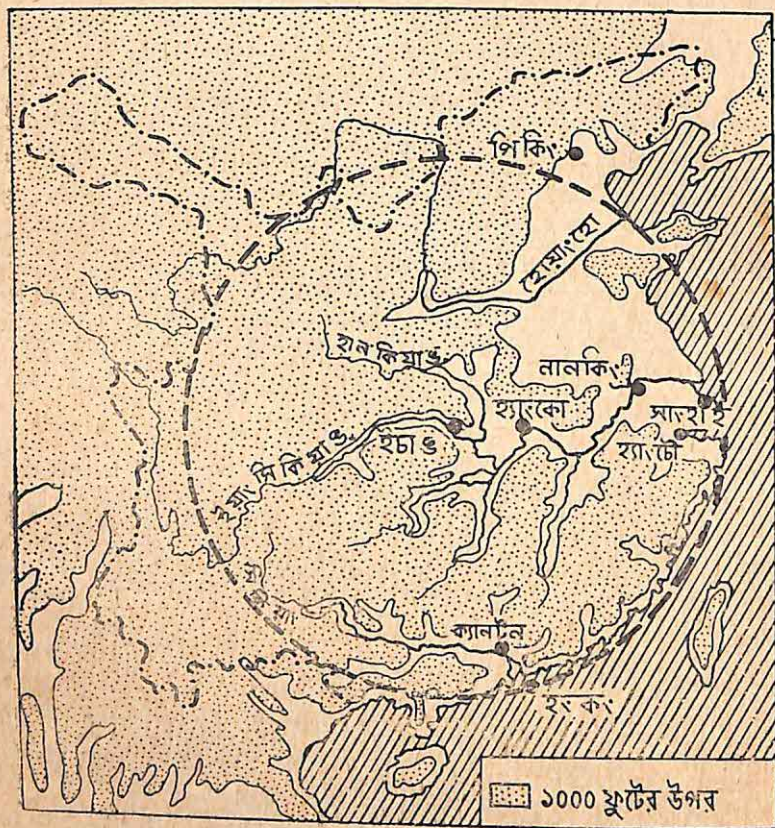
চীনের নদীপথ ও কয়েকটি নগরের অবস্থান

তাণ্ডব, আবার কোন কোন অঞ্চলে শীত বা গ্রীষ্মের তীব্রতা একেবারেই নাই। চীনের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জুড়িয়া দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিশাল মরুভূমি। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া হোয়াং-হো

এবং ইয়াং-সিকিয়াঙ-এর জলধারা প্রবাহিত সেই সব অঞ্চলের জমি খুবই উর্বর।

চীনের বন্যা ও কিংবদন্তী—যে দুটি নদীর জলধারায় চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষির উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মধ্যে হোয়াং-হো নদীটি চীনের অধিবাসীদের কাছে শুধু আশীর্বাদ রূপেই দেখা দেয় নাই; অনেক সময় ইহা দেখা দিয়াছে অভিশাপ রূপে। এই নদীটির উৎপত্তি তিব্বতের পাহাড়ী অঞ্চলে। ২৬০০ মাইল দীর্ঘ নদীটি চিরলের উপসাগরে মিশিয়াছে। সমতলভূমিতে এই নদীর দু'পাশে হলুদ রঙের পলিমাটির সৃষ্টি হইত। তাই এই নদীটির আর একটি নাম পীত নদী। পলি জমিয়া মাটি ক্রমশঃ উঁচু হওয়ার ফলে সৃষ্টি হইত বাঁধের। কিন্তু জলপ্লাবনের ফলে যখন বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িত তখনই শুরু হইত প্রলয়ঙ্কর বন্যা। এই বন্যার তাণ্ডবে তখন ভাসিয়া যাইত ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার, লোকজন, পশুপাখী। চীনদেশের বহু উপাখ্যানে এই নদীর তাণ্ডবের কাহিনীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের এক সম্রাট এই কারণে নদীটিকে অভিহিত করিয়াছেন **'চীনের দুঃখ'** বা "**অভিশাপ**' রূপে। চীনের একটি প্রাচীন প্রবাদের মতে—হয় খরা, নয় বন্যা—এ দেশে মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া? অথচ প্রকৃতির এই অভিশাপকে তুচ্ছ করিয়া চীনদেশের অধিবাসীরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল সমৃদ্ধতর সভ্যতার পথে।

॥ ৬ ॥ প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য—এতক্ষণ আমরা মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ কি ভাবে হইয়াছিল তাহা দেখিয়াছি। জলবায়ুর ভেদে সব ক'টি দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ একই ভাবে ঘটে নাই। প্রত্যেকটি দেশের সভ্যতার আপন আপন বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন দেশের সভ্যতার মধ্যে একটি বিষয়ে ঐক্য ছিল। যে ক'টি দেশের কথা

আমরা আলোচনা করিয়াছি তাহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিল সেই সব দেশের প্রধান প্রধান নদনদী। মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার বিকাশের মূলে ছিল টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস-এর জলধারা। মিশরের ক্ষেত্রে যেরূপ নীলনদ, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তেমনই ছিল সিন্ধুনদের প্রভাব। চীনদেশের যে অঞ্চল জুড়িয়া সভ্যতা ও সমৃদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহার মূলেও ছিল হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াঙ-এর প্রভাব।

নদীর সহিত সভ্যতার সম্পর্ক আকস্মিক ব্যাপার নয়। আমরা সকলেই জানি যে প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সব ক'টি কেন্দ্রই অবস্থিত ছিল নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার পর যখন মানুষ কোন একটি অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সংকল্প গ্রহণ করে তখন তাহারা স্বাভাবিক কারণেই বাছিয়া লইয়াছিল নদীতীরবর্তী অঞ্চল। এই সব অঞ্চল ছিল স্বভাবতই উর্বর, অল্প পরিশ্রমে এখানে জলসেচ সম্ভব ছিল। অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানে ফসলও ফলিত বেশী পরিমাণে। এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের চাহিদা মিটাইবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে, এমন কি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশেও রপ্তানি করা সম্ভব ছিল। ইহার ফলে দেশের আর্থিক সম্পদ বাড়ানোর পথ সুগম হইয়াছিল। তাছাড়া নদীপথে দেশবিদেশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল। ইহার ফলে অন্যান্য দেশের সহিত পরিচয়ের মাধ্যমে উদঘাটিত হইল নূতন নূতন জ্ঞানের ভাণ্ডার।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন—নদীমাতৃক বিভিন্ন দেশের উন্নতি এবং সভ্যতার ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আদিম যুগের মানুষরা প্রথমে ছিল কৃষিজীবী অথবা শিকারী। পরে কৃষির উন্নতি ও প্রসারের পর তাহাদের মধ্যে দেখা দিল শিল্প এবং বাণিজ্য সম্পর্কে আগ্রহ। ইহার ফলে একদিকে যেমন দেখা গেল নূতন নূতন বৃত্তি এবং নূতন নূতন শিল্পোদ্যম, অপর দিকে তেমনই ঘটিল বাণিজ্যের প্রসার। চাহিদার মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রসার ঘটিতে লাগিল, ফলে শিল্পীদের শ্রেণী এবং সংখ্যা

দুইই বাড়িয়া চলিল। এককালে জমির মালিকদের লইয়া গঠিত হইত সমাজের ধনী শ্রেণী। পরে বণিকরাও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল শ্রমিকদের প্রয়োজন। জঙ্গল পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট তৈয়ারী করা, ঘরবাড়ী নির্মাণ করা, নদীতে বাঁধ দেওয়া—বহুকাল পর্যন্ত এইসব কারণেই শ্রমিকদের প্রয়োজন হইত। নূতন পরিস্থিতিতে দেখা গেল কাঁচা মাল সংগ্রহ, নানা ধরনের শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন এবং বণ্টনের জন্য অধিক সংখ্যায় শ্রমজীবী নিয়োগের প্রয়োজন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ভাবে দেখা দিল পরিবর্তন।

সব ক'টি দেশেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও এই পরিবর্তনের গতি সর্বত্র একই ধরনের ছিল না। কোন কোন দেশে বহুকাল ধরিয়া কৃষিই ছিল জাতির বা দেশের প্রধান সম্পদ। কোন কোন দেশে কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য লাভ করিয়াছিল বেশী গুরুত্ব। মেসোপোটেমিয়ায় বহু দিন পর্যন্ত শহর অপেক্ষা গ্রামের প্রাধান্যই ছিল বেশী। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার যুগে ভারতবর্ষের যে পরিচয় পাই তাহাতে দেখা যায় প্রথম হইতেই শহর এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রের প্রাধান্য। মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় আমরা বিনা মজুরীতে শ্রমিকদের কাজে লাগানোর প্রথা যেমন ব্যাপক আকারে দেখিতে পাই, চীন অথবা ভারতবর্ষে তাহার প্রচলন ছিল না বলিয়া মনে হয়।

অনুশীলনী

(ক) মেসোপোটেমিয়া

১। পৃথিবীর সব জায়গায় একই সঙ্গে সভ্যতার বিকাশ ঘটে নাই। সারা পৃথিবী জুড়িয়া মাত্র চারিটি অঞ্চলে ঘটিয়াছিল সভ্যতার অভ্যুদয়—মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারতের সিন্ধু উপত্যকা এবং চীন।

২। মেসোপোটেমিয়া-অঞ্চলের উর্বরতার মূলে রহিয়াছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের বিপুল জলধারা। এই অঞ্চলের সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল সুমের জাতি।

৩। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের জলধারা একদিকে যেমন জমিকে উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল অপর দিকে এই নদী দুইটির তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল শিল্প-বাণিজ্যের সম্ভাবনা।

৪। স্থাপত্য ও সুকুমার শিল্পে সুমেরদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের দুর্গ, তোরণ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে, দেওয়াল চিত্রে, পাথর কাটায়, লিপিমালায়। যানবাহন পরিকল্পনায় এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাদের সফলতা উল্লেখযোগ্য।

(খ) মিশর

১। মিশরের অবস্থান আফ্রিকার উত্তরভাগে। মিশর সীমান্তের পর বিস্তীর্ণ মরুভূমি। কিন্তু মিশরের জমির উর্বরতার তুলনা হয় না। মিশরের জমির উর্বরতার মূলে রহিয়াছে নীল নদের জলধারা।

২। প্রাচীন মিশরী সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন ফেরারো এবং পুরোহিত। এছাড়া লিপিকারগণও সে যুগে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংকার চালু রাখার জন্য প্রয়োজন হইত রাজস্ব সংগ্রহকারী আমলা এবং সৈন্যবাহিনীর।

৩। মিশরীরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুদান ছাড়া পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময় করিত।

৪। প্রাচীন মিশরের অত্যাশ্চর্য স্থাপত্য কীর্তি পিরামিড বা সমাধি মন্দির

৫। প্রাচীন যুগের মিশরীরা বিশ্বাস করিত যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উপর ছেদ পড়ে না। মৃতদেহ যতদিন অবিকৃত থাকিবে ততদিন মৃত ব্যক্তির আত্মার কোন কষ্ট হইবে না—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা মৃতদেহকে বহু যত্নে সমাধিকক্ষে রক্ষা করিত।

৬। মিশরে বহু বৃত্তিধারী লোকের বসবাস ছিল। রাজা, পুরোহিত, আমলা এবং সৈনিকদল ছাড়া মিশরের অধিবাসীদের মধ্যে ছিল কৃষক, চর্মশিল্পী, ধাতুশিল্পী, কামার, কুমোর, ছুতোর, শিকারী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিধারী সম্প্রদায়।

(গ) সিন্ধু উপত্যকা

১। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের কয়েকটি অঞ্চলের মাটি খুঁড়িয়া নানা ধরনের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এইসকল আবিষ্কারের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসর আগে সিন্ধু উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়িয়া অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল এক সুসমৃদ্ধ সভ্যতার।

২। যে সকল অঞ্চলে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরপ্পা, চান্‌হুদাড়ো, মোহেঞ্জদাড়ো, সুতকাগেনদোর, রূপার, লোথাল, মেঘাম প্রভৃতি।

৩। প্রাচীন যুগের যে সকল নির্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীলমোহর, জীবজন্তুর মূর্তি, বাসনপত্র, খেলনা, চিরুনী, নানা ধরনের অলঙ্কার, ঘরবাড়ী এবং শহরের বহু স্মৃতিচিহ্ন।

৪। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা। এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। সেই যুগের সমাজের শীর্ষস্থানে যাহারা অধিষ্ঠিত ছিল তাহাদের প্রধান উপজীব্য ছিল কৃষির মালিকানা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করিত। এই যুগে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

৫। এই যুগের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে কোন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই যুগের অধিবাসীরা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাহাদের প্রধান উপাস্য ছিলেন জগদম্বা এবং পশুপতি শিবের আদিরূপ।

(ঘ) চীনদেশ

১। প্রাচীন মানব-সভ্যতার আর একটি কেন্দ্র চীন। চীনের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার মূলে ছিল হোয়াং-হো এবং ইয়াং-সিকিয়াঙ নদী দুটির দান। অনেক সময় নদীতে দেখা যাইত প্রবল বন্যা। তবু প্রকৃতির তাণ্ডব উপেক্ষা করিয়া চীনদেশের অধিবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে গড়িয়া তুলিয়াছিল এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বনিয়াদ।

প্রশ্নমালা

(ক) মেসোপোটেমিয়া

১। নীচে সভ্যতার চারিটি পীঠস্থানের নাম লেখা হইল। এগুলিকে সময়-সীমা অনুসারে পর পর সাজাও :—

সিন্ধু উপত্যকা, চীন, মেসোপোটেমিয়া ও মিশর।

২। 'মেসোপোটেমিয়া' কথাটির প্রকৃত অর্থ কি?

৩। মেসোপোটেমিয়ায় কোন্ জাতি সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিলেন?

৪। মেসোপোটেমিয়ার লিপিমালার বৈশিষ্ট্য কি? এই লিপিকে cuneiform লিপি বলা হয় কেন?

৫। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ার যে কোন চারিটি প্রধান নগরের নাম লেখ।

৬। সুমেরদের মন্দির দেখিতে কিরূপ ছিল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(খ) মিশর

৭। নীলনদকে কি কারণে 'মিশরের প্রাণ' বলা হয় ?

৮। শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :—

(ক) মিশর-রাষ্ট্রের প্রধানকে বলা হইত —।

(খ) স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মিশরীদের এক অক্ষয় কীর্তি —।

(গ) মিশরীদের উপাস্য অন্যতম প্রধান দেবতা —।

৯। কাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে ?

(ক) তিনি মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

(খ) তিনি শুধু রাজাই ছিলেন না। প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতার প্রতিনিধি ; এমন কি স্বয়ং দেবতা।

১০। মিশরের লিপিমালার বৈশিষ্ট্য কি ? সুমেরদের লিপিমালার সঙ্গে মিশরী লিপিমালার পার্থক্য কি ?

১১। কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্য-বিনিময় হইত ? মিশরীরা কি কি জিনিস আমদানি করিত ?

(গ) সিন্ধুসভ্যতা

১২। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোন্ কোন্ অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে ?

১৩। হরপ্পা ও মোহেঞ্জদাড়োতে পাওয়া গিয়াছে এমন কয়েকটি নিদর্শনের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

১৪। সিন্ধু উপত্যকায় কি কি বৃত্তিধারী সম্প্রদায় বসবাস করিত ?

১৫। 'মোহেঞ্জদাড়ো' কথাটির অর্থ কি ?

১৬। হরপ্পা ও মোহেঞ্জদাড়ো হইতে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ছবি সংগ্রহ করিয়া অ্যালবাম তৈয়ারী কর।

(ঘ) চীনদেশ

১৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) চীনদেশের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে—ও—এই নদী দুটির প্রভাব।

(খ) চীনদেশের সভ্যতার স্রষ্টা চীন দেশের আদিম বাসিন্দারাই। ইহারা জাতিতে —।

১৮। (ক) হোয়াং-হোকে কি কারণে পীত নদী বলা হয় ?

(খ) এই নদীটির দৈর্ঘ্য কত ?

(গ) এই নদীটিকে 'চীনদেশের দুঃখ' বলিয়া অভিহিত করা হয় কেন ?

———

৫ লোহার প্রচলন-সমসাময়িক সমাজ

বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে প্রয়োজনের দিক হইতে মানুষের পক্ষে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল লোহা। সোনা, রূপা, তামা, টিন প্রভৃতি ধাতুর তুলনায় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সব চাইতে বেশী কাজে লাগে লোহার ব্যবহার।

লোহার আবিষ্কার—আদিম যুগের মানুষ বহু কাল পর্যন্ত শুধু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। তারপর সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে গিয়া মানুষ শিখিল বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার—সোনা, রূপা, তামা, টিন, ব্রোঞ্জ। তখনও লোহার ব্যবহার মানুষের আয়ত্ত হয় নাই। কবে কোথায় কী ভাবে লোহার আবিষ্কার সম্ভব হইল তাহা সন তারিখের হিসাব মিলাইয়া বলা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ একটি অঞ্চলের মানুষ এই ধাতুটির আবিষ্কার করিয়াছিল, ইহাও বলা যায় না। খুব সম্ভব, একই সঙ্গে একাধিক অঞ্চলে এই ধাতুটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মিশরের পিরামিডের গঠনে লোহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা সম্ভব যে আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসর আগে এই ধাতুটির সহিত মিশরবাসীদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও লোহা গলানো এবং কাজে লাগানোর কৌশল খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর আগে আয়ত্ত করিয়াছিল—ইহাও অনেকের ধারণা।

ব্যবহার—কি ভাবে লোহা গলাইয়া তাহার সাহায্যে হাতিয়ার এবং বাসনপত্র তৈয়ারী করার কৌশল মানুষ আয়ত্ত করিয়াছিল তাহাও আমাদের অজানা। তবে অনুমান করা সম্ভব যে পাহাড়ের যে অঞ্চলে লোহার খনি ছিল সেই সব অঞ্চলে যদি হঠাৎ কোন কারণে আগুন লাগিত তাহা হইলে কি ভাবে লোহা গলিয়া নূতন চেহারা ধারণ করিত—আদিম যুগের মানুষ কোন এক সময় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই কারণে, আগুনের সাহায্যে

লোহা গলাইয়া তাহার সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী করা সম্ভব—এ ধারণা মানুষের মনে দেখা দিয়াছিল। এই কৌতূহল মিটাইবার উদ্দেশ্যেই বড় বড় কাঠের গুঁড়ি পুড়াইয়া তাহাতে লোহা গলাইয়া লোহার পাত প্রস্তুত করার কৌশল মানুষের করায়ত্ত হইয়াছিল। ক্রমে এই সকল পাতের সাহায্যে মানুষ তৈয়ারী করিতে শিখিল নানা ধরনের হাতিয়ার, নিত্যব্যবহার্য বাসনপত্র ইত্যাদি।

লৌহ আবিষ্কারের প্রভাবঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন—সভ্যতার ইতিহাসে লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতদিন যে সকল ধাতু ব্যবহার করিয়া মানুষ তাহার প্রয়োজন মিটাইত তাহা ছিল ব্যয়সাধ্য। ধনী লোক ছাড়া সাধারণ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ঐ সব মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য ধাতুর সাহায্য গ্রহণ সম্ভব ছিল না। এবার লোহা আবিষ্কারের ফলে অল্প ব্যয়ে এবং কম পরিশ্রমে সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিতে শিখিল। সুতরাং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য ধনী লোকদের উপর নির্ভর করিয়া থাকার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল। এবার সাধারণ শ্রেণীর মানুষও নিজের উদ্যোগে নিজেকে বলীয়ান করিয়া তোলার সুযোগ পাইল। কৃষির জন্য প্রয়োজন হইত প্রথমে কোদাল পরে লাঙ্গল। এবার লোহার সাহায্যে লাঙ্গল এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা সম্ভব হওয়ায় সমাজে দেখা গেল ছোট ছোট জমির মালিকের আবির্ভাব। এতদিন সমাজ গঠিত ছিল একদিকে ধনী এবং অন্যদিকে দরিদ্র শ্রমজীবীদের লইয়া। এবার দেখা গেল আরও একটি নূতন সম্প্রদায়। ইহাদের আমরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলিতে পারি। এই নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ফলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতিতে দেখা গেল বিস্ময়কর পরিবর্তন। অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া শুধুমাত্র নিজেদের উদ্যম সম্বল করিয়া মানুষ নিজেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে পারে—এই সম্ভাবনা মানুষকে পরিচালিত করিল নূতন সমাজ নূতন অর্থনীতি এবং নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার কাজে।

রাজার শক্তিহ্রাস—লৌহযুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের মধ্যে। আদিম যুগে রাজা ছিলেন সকল শক্তির উৎস। সুতরাং সকল বিষয়ে বিনা প্রশ্নে রাজার আদেশ মানিয়া চলাই ছিল প্রজাদের ধর্ম। আদিম যুগের প্রথম ভাগে রাজার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু লোহার ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা আগের তুলনায় কিছু পরিমাণে কমিতে শুরু করে। এতদিন প্রজারা সম্পূর্ণভাবে রাজার উপর নির্ভরশীল ছিল। রাজাই তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিতেন। কিন্তু লোহার ব্যবহার প্রচলনের পর হইতে সাধারণ মানুষের পক্ষেও নিজেদের চেষ্টায় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা সম্ভব হইল। ফলে রাজা ছাড়া অন্য লোকদের মধ্যে যাহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথবা যাহারা শক্তি অর্জনে আগ্রহী ছিল তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনের পথ সুগম হইয়া উঠিল। ইহার ফলে রাজার একাধিপত্য বজায় রাখার পথে দেখা দিল বাধা।

॥ ক ॥ ব্যাবিলন

মেসোপোটেমিয়ার আদিম সভ্যতার কথা আগের এক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সেই সভ্যতার স্রষ্টা ছিল সুমের জাতি। সুমের জাতির পর মেসোপোটেমিয়ায় প্রাধান্য লাভ করে আক্কাদ জাতি। ইহার পর সমগ্র দেশ জুড়িয়া স্থাপিত হয় ব্যাবিলনের অধিবাসীদের প্রাধান্য। ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে মেসোপোটেমিয়ার পরবর্তীকালীন ইতিহাস।

কৃষি ও বাণিজ্য—ব্যাবিলনের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। এখানকার জমি ছিল অতিশয় উর্বর। অল্প পরিশ্রমে এখানকার জমিতে প্রচুর ফসল হইত। এছাড়া ছিল পশুচারণ ক্ষেত্র। কৃষি ছাড়া পশুপালনও ছিল জীবিকা অর্জনের আর একটি উপায়। কৃষক ও পশুপালক ছাড়া সমাজে আরও একটি শ্রেণী ছিল। ইহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিত। ব্যাবিলন হইতে বণিকরা জলপথে দেশ-দেশান্তরে যে সকল পণ্য রপ্তানি করিত তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পশম, ধাতু-নির্মিত নানা ধরনের পণ্য, বহুমূল্য পাথর, কাঠ এবং খাদ্যশস্য।

টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসে স্রোতের বেগ ছিল প্রবল ; উজান বাহিয়া নৌকা চলাচল সহজ ছিল না, কিন্তু ভাঁটার পথে নৌকা এবং ভেলা অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারিত। স্থলপথে গাধা ও বলদে টানা গাড়ী ছিল ব্যবসায়ীদের প্রধান অবলম্বন। ব্যাবিলনের নারীরাও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ পাইতেন।

দেবমন্দির ও পুরোহিত—ব্যাবিলনের অধিবাসীরা বহু দেবদেবীর উপাসনা করিত। প্রথমে দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন বায়ু-দেবতা **এন্‌লিল**। নিপ্‌পুর শহরে এই দেবতার এক বিরাট মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পরের যুগে এন্‌লিলের পরিবর্তে দেবদেবীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন **মারডুক** এবং **ইস্‌তার**। প্রথম জন ছিলেন সৃষ্টির দেবতা, আর ইস্‌তার প্রেমের দেবী। দেবতাদের উদ্দেশে যে সকল মন্দির নির্মিত হইত তাহা দেখিতে ছিল অনেকটা দুর্গের মতো। সাধারণভাবে প্রতিটি মন্দিরে থাকিত পর পর সাজানো সাতটি চূড়া। এগুলিকে মনে হইত মিশরের পিরামিডের ছোটখাটো সংস্করণ।

দেবতাদের পূজারী হিসাবে পুরোহিতরা সমাজে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করিতেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে পুরোহিতরা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। যাগযজ্ঞ উপলক্ষে যে সকল পশু বলি দেওয়া হইত তাহাদের, বিশেষতঃ ভেড়ার, যকৃৎ পরীক্ষা করিয়া পুরোহিতরা ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারিতেন। অনেক সময় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়াও তাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতি—সুমেররা যখন মেসোপোটেমিয়ায় প্রাধান্য স্থাপন করে তখন হইতেই এ দেশে বিদ্যাচর্চা হইত। আমরা আগে দেখিয়াছি যে এই দেশের অধিবাসীরা প্রথমে ছবির সাহায্যে তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিত। পরে তাহারা ত্রিকোণবিশিষ্ট গোঁজের সাহায্যে নরম মাটির বুকে আঁচড় কাটিয়া লেখার কাজ চালাইত। নরম মাটিকে আগুনে পুড়াইয়া শক্ত করিয়া লইলে এই ধরনের লেখা অনেক দিন পর্যন্ত টিকিয়া থাকিত। চিঠিপত্র, রাজকীয় আদেশ, হিসাব নিকাশ, দেশের আইনকানুন সব কিছু

এই ভাবে মাটির ফলকে লিখিয়া রাখা হইত। এই ধরনের উপকরণের সাহায্যে লেখায় যাহাতে এক শ্রেণীর অধিবাসী দক্ষতা অর্জন করিতে পারে সেজন্য তাহাদের বিশেষ ধরনের শিক্ষানবিশী করিতে হইত। সাধারণত মন্দিরের পুরোহিতেরা এই ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। আজ হইতে সাড়ে চার হাজার বৎসর আগে মাটির ফলকে মেসোপোটেমিয়ার যে মানচিত্র আঁকা হইয়াছিল তাহা পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাবিলনের প্রাচীন সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ছিল দেবদেবীদের সম্পর্কে রচিত নানা ধরনের উপাখ্যান। বেশীর ভাগ উপাখ্যান লেখা হইত পদ্যের আকারে। গিলগেমিশ নামে এক কাল্পনিক বীরপুরুষের কীর্তিকলাপ লইয়াও অনেক কাহিনী রচিত হইয়াছিল।

হাম্মুরাবি ও তাঁহার আইন-সঙ্কলন—কালক্রমে ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র মেসোপোটেমিয়া জুড়িয়া স্থাপিত হয় এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের অধিপতিদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন রাজা **হাম্মুরাবি** (২১০০ খ্রীঃ পূঃ)। সুমের এবং এলাম-এর অধিবাসীদের পরাজিত করিয়া ইনি অর্জন করিয়াছিলেন অসাধারণ সামরিক কীর্তি। তাঁহার সুশাসনে সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়িয়া বর্তমান ছিল শান্তি এবং সমৃদ্ধি। এই সময়ে কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল অভাবনীয় উন্নতি। হাম্মুরাবি বিভিন্ন উপজাতিদের কলহ বিবাদ দমন করিয়া নিজের সর্বময় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দেশের প্রচলিত আইনকানুনের সঙ্কলন। ৮ ফুট উঁচু একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ রহিয়াছে এই সব আইন—প্রস্তরখণ্ডের শীর্ষে একটি ছবিতে দেখা যাইতেছে হাম্মুরাবি কিভাবে সূর্যদেবতার কাছ হইতে এই সকল আইনের নির্দেশ লাভ করিতেছেন। কোন

হাম্মুরাবি

কোন আইনে দরিদ্র এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, আবার কোন কোন আইনে প্রতিহিংসামূলক আচরণেরও সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, যদি কোন বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ার ফলে বাড়ীর মালিকের পুত্র প্রাণ হারাইত তাহা হইলে যে ব্যক্তি বাড়ীটি তৈয়ারী করিয়াছিল তাহার পুত্রকে আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান ছিল।

হাম্মুরাবির আইন-সঙ্কলন হইতে আমরা সে-যুগের সমাজ-জীবনের কিছুটা পরিচয় পাই। দলপতিদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করার ফলে তখন রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব সকলে মানিয়া চলিত। দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের মাত্রা ইহার ফলে অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছিল। সমাজে তখন প্রধানত তিন শ্রেণীর লোক ছিল। প্রথম শ্রেণী গঠিত ছিল ধনী ব্যক্তিদের লইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল দরিদ্র শ্রেণী আর তৃতীয় ও সর্বনিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইত ক্রীতদাসরা। আইনের চোখে সকলে সমান বলিয়া গণ্য হইত না। ধনী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তি হইত বেশী। দরিদ্র ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একই ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল কম। কিন্তু কোন অবস্থায়ই জনসাধারণ নিজেদের হাতে শাস্তিদানের অধিকার ভোগ করিতে পারিত না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাহাদের মানিয়া চলিতে হইত রাজকীয় আইন। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন কোন বিষয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হইত তখন তাহা কার্যকর করার জন্য লিখিত চুক্তিপত্র বাধ্যতামূলক ছিল। এই কারণে ব্যাবিলনের নথিপত্রের মধ্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে চুক্তিপত্রের ছড়াছড়ি। চুক্তি ভঙ্গ করিলে অপরাধীকে শাস্তি দানের দায়িত্ব ও অধিকার ছিল রাষ্ট্রের। কোন ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করিলে চুক্তি অনুযায়ী ঋণ শোধ করিতে না পারিলে আইন অনুসারে তাহাকে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে হইত। যুদ্ধবন্দীদের পক্ষেও ক্রীতদাসবৃত্তি বাধ্যতামূলক ছিল। পরিবারের প্রত্যেকের উপর পরিবারের প্রধানের কর্তৃত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত। পরিবারের প্রধান ইচ্ছা করিলে পরিবারভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতে পারিতেন। প্রাচীন ব্যাবিলনের সমাজে নারীরা নিজ অধিকারে সম্পত্তি ভোগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিতেন।

॥ খ ॥ মিশরের সাম্রাজ্য

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা—আদিম যুগ পার হইয়া মানুষ যখন সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-যাপন শুরু করে তখন তাহারা বাস করিত কয়েকটি খণ্ড বিচ্ছিন্ন জনপদে। পরে এই সকল জনপদ জুড়িয়া স্থাপিত হয় অখণ্ড রাজ্য। মিশরে প্রথমে দুটি আলাদা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরে এই দুটি রাজ্যকে এক সঙ্গে জুড়িয়া রাজা **মেনেস্** মিশরে স্থাপন করেন একটি অখণ্ড রাজ্য (খ্রীঃ পূঃ ৩৪০০)। মেনেস্-এর রাজবংশ **প্রথম রাজবংশ** নামে পরিচিত। প্রাচীন মিশরে তিন হাজার বৎসর জুড়িয়া ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন **৩৩টি বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিনিধিরা**।

যে রাজবংশের নেতৃত্বে মিশরে প্রথম পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় তাহা একাদশ রাজবংশ (খ্রীঃ পূঃ ২১৬০)। এই সময়ে মিশরের রাজধানী স্থাপিত ছিল থীব্স নগরে। এই রাজবংশের নেতৃত্বে সমগ্র মিশর জুড়িয়া স্থাপিত হয় এক অখণ্ড রাজ্য। ক্রমে একদিকে রাজ্যের আয়তন, অপরদিকে রাজাদের ক্ষমতা ও মর্যাদাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অষ্টাদশ রাজবংশ যখন ক্ষমতায় আসীন তখন মিশরের আধিপত্য এশিয়ার ইউফ্রেটিস-এর তীরবর্তী অঞ্চল হইতে আফ্রিকার নীল নদের পঞ্চম জলপ্রপাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিশরের সম্রাটরা ফেয়ারো নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রান্ত ছিলেন **তৃতীয় থুৎমস্** (খ্রীঃ পূঃ ১৫১৫-১৪৬৬)। তাঁহার রাজত্ব কালে মিশরের সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সাইপ্রাস, ক্রীট প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপের অধিবাসীরা তাঁহাকে কর দিত। মিশরের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট **তৃতীয় রামেশেশ** (খ্রীঃ পূঃ ১৩২৫-১২৫৮)।

ধর্মবিশ্বাস ও পুরোহিতদের প্রতিপত্তি—মিশরের অধিবাসীরা বহু দেবদেবীর উপাসনা করিত। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্যদেবতা **রা** (পরে ইনি পরিচিতি হন **আমন-রা** নামে), পাতালের রাজা **অসিরিস**, জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা **থৎ** এবং সৃষ্টিকর্তা **'টা**। আমরা আগে দেখিয়াছি যে মিশরে দেবদেবীদের উদ্দেশে পূজার্চনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই জন্য সমাজে

পুরোহিতদের স্থান ছিল রাজার পরেই। ইঁহারা সাধারণত মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যেই বাস করিতেন। পুরোহিতরা মন্ত্রতন্ত্র ছাড়া যাদুবিদ্যাও জানিতেন। ইঁহারা ভবিষ্যৎও গণনা করিতে পারিতেন। প্রাচীন মিশরীরা বিশ্বাস করিত যে মৃত্যুর পরেও আত্মা বাঁচিয়া থাকে। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময়ে কি কি রীতিনীতি পালন করিলে আত্মার সহিত দেহের পুনরায় যোগাযোগ হইতে পারে তাহা পুরোহিতদের জানা ছিল। এই কারণে সাধারণ মানুষের কাছে পুরোহিতরা ছিলেন বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের পাত্র। তাঁহারাই ছিলেন প্রাচীন বিদ্যার ধারক ও বাহক। তাঁহাদের অনেকেই প্রচুর জমিজমা ও অর্থসম্পদের ও উচ্চ পদের অধিকারী ছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর অনেক সময় বিজিত অঞ্চলের জমির স্বত্ব পুরোহিতদের নামে লিখিয়া দেওয়া হইত। আমন-রা (পরবর্তী সূর্যদেবতা) নামক দেবতার প্রধান পুরোহিত অর্থসম্পদের দিক হইতে ফেয়ারো-র সমকক্ষ ছিলেন। পরবর্তী যুগে রাজা ও পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ মিশরের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসের একটি প্রধান কারণ রূপে দেখা দিয়াছিল।

মিশরের দেবতা
আমন রা

॥ গ ॥ ইরাণ

ইরাণের অভ্যুদয়—ভারতবর্ষের পশ্চিমে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত পারস্য বা ইরাণ দেশ। এই দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল আর্য জাতির একটি শাখা। আর্যরা নিজেদের আদি বাসভূমি ছাড়িয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিতে শুরু করিলে এক গোষ্ঠী ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল তাহাদের নূতন বাসভূমি রূপে বাছিয়া লয়। অপর এক গোষ্ঠী দুভাগে ভাগ হইয়া এক ভাগ ভারতে বসতি স্থাপন করে, অপর শাখা বাছিয়া লয় ইরাণ অঞ্চল। ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার পতনের পর মধ্য-এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া স্থাপিত হয় ইরাণ বা পারস্যের প্রাধান্য।

সাম্রাজ্য বিস্তার—এই প্রাধান্যের মূলে ছিল পারসিক সম্রাটদের সামরিক কৃতিত্ব। প্রথম সম্রাট **কুরুষ** (খ্রীঃ পূঃ ৬৫০) পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গড়িয়া তোলেন এক শক্তিশালী রাজ্য। পরে তাঁহার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী লইয়া তিনি বাহির হন দিগ্বিজয়ে। একে একে এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, ব্যাবিলন এবং আসিরিয়া জয় করিয়া তিনি স্থাপন করেন এক বিশাল সাম্রাজ্য। সম্ভবতঃ তাঁহার বিজয় বাহিনী ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলেও হানা দিয়াছিল। পরবর্তী সম্রাট **কাম্বিসেস** (খ্রীঃ পূঃ ৫২৯) মিশর জয় করিয়া রাজ্যের আয়তন আরও বাড়াইয়া তোলেন। ইহার পর পারস্যের সিংহাসন লাভ করেন **প্রথম দারায়ুস** (খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৪৮৫)। পূর্ববর্তী শাসকদের মতো তিনিও ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। মিশর হইতে ভারতের সিন্ধুনদের উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীন। আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জও তাঁহার

গ্রীক বনাম পারসিক যোদ্ধা

শাসনাধীন ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি গ্রীস দেশ জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র **জেরাক্সেস**-ও বারবার চেষ্টা করিয়া গ্রীস দেশ জয়ের সঙ্কল্প সফল করিতে পারেন নাই। তৃতীয় দারায়ুসের রাজত্বকালে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার পারসিক প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া স্থাপন করেন গ্রীসের সর্বময় প্রভুত্ব (খ্রীঃ পূর্ব ৩৩৩)।

সম্রাটদের কৃতিত্ব—কুরুষ যে রাজবংশ স্থাপন করেন তাহা আকিমিনিদ বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের প্রাধান্য ২২০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। পারসিক সম্রাটরা শুধু দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না, বিজিত রাজ্যে যাহাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিকেও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতেন। প্রজাদের অসহনীয় করভার বহন করিতে হইলেও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতির এবং প্রচলিত আইনকানুনের উপর সম্রাটরা তেমন ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রজারা, বিশেষতঃ বণিকরা, যাহাতে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে সেজন্য মাইলের পর মাইল জুড়িয়া তাঁহারা দীর্ঘ, প্রশস্ত রাজপথ তৈয়ারী করিয়া দিতেন। রাজপথের দুই পাশে থাকিত বিশ্রাম এবং আহারের জন্য সরাইখানা। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপন পারসিক সম্রাটদের আর একটি প্রধান কীর্তি। এই উদ্দেশ্যে দারায়ুস একদিকে খাল খনন, অন্যদিকে নৌবহর গঠনের উপযোগী বহু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জেরাক্সেস-এর অধীনে ছিল ১২০০ রণতরী।

ধর্মগুরু জরথুস্ত্র—রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে পারসিকদের সাফল্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে পারস্যের ধর্মগুরু **জরথুস্ত্রের** অবদান। ইনি আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূল বাণী এই যে, জগতে দুইটি বিরোধী শক্তির মধ্যে চলিতেছে অবিরাম সংগ্রাম: একটি শুভ শক্তি, অপরটি অশুভ শক্তি—একদিকে আলো, অন্যদিকে অন্ধকার; একদিকে সত্য, অপর দিকে মিথ্যার কুহক। যাহারা তাঁহার কাছে ধর্মের কথা শুনিতে আসিত তাহাদের উদ্দেশে তিনি বলিতেন—'তোমরা সত্যের পথ, আলোর পথ বাছিয়া লও।' এই শুভ শক্তির উৎস **মাজদা** বা অহুর-মাজদা। অশুভ শক্তির প্রতীক অহ্‌রিমান। জরথুস্ত্র সকলের প্রতি আহ্বান জানাইতেন অহুর-মাজদার প্রতি অনুগত থাকিতে। শুভ-শক্তির বিরোধিতা করিলে তাহার পরিণাম হইবে ভয়ঙ্কর—এই সতর্ক বাণী তিনি সর্বদা উচ্চারণ করিতেন। জরথুস্ত্রের ধর্মমত ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। ইহার মধ্যে কোন তাত্ত্বিক জটিলতা ছিল না। শিক্ষিত,

অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষ ইহার মর্ম সহজেই বুঝিতে পারিত। পরবর্তী কালে তাঁহার মতবাদ লইয়া রচিত হয় **আবেস্তা** নামে পরিচিত ধর্মগ্রন্থ।

॥ ঘ ॥ ইহুদী জাতির কথা

ইহুদীরা মিশরে অবাঞ্ছিত আগন্তুক—ইহুদীরা মধ্য প্রাচ্যের এক প্রাচীন জাতি। ইহাদের আদি বাসভূমি ছিল আরবদেশের মরু-অঞ্চলে। এখানে চাষ-আবাদ হইত না। খাদ্য পানীয় কোনটাই সহজে পাওয়া যাইত না। এই কারণে ইহারা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ানোতে অভ্যস্ত ছিল। পশুচারণের ক্ষেত্র এবং চাষ আবাদের উপযোগী জমি খুঁজিতে খুঁজিতে ইহারা এক সময় প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হয়। ইহারা প্রথমে এই অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় বসবাস করিতে থাকে। ক্রমে এখানকার আদিম অধিবাসীদের রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া এই দেশকে তাহারা স্বদেশ বলিয়া মনে করিতে শিখিল। কিন্তু এখানকার জমির আয়তন ছিল খুবই সীমিত। সুতরাং শুধু মাত্র এই অঞ্চলটি সম্বল করিয়া তাহাদের পক্ষে সচ্ছল জীবন যাপন সম্ভব হইল না। আরও নূতন জমির খোঁজে তাহারা আসিয়া হাজির হইল মিশর দেশে। এখানে তখন ফেয়ারোদের কঠোর শাসন। ফেয়ারো এবং তাঁহার পরামর্শদাতারা এই আগন্তুকদের সুনজরে দেখিলেন না। ফলে ইহুদীদের ভাগ্যে জুটিতে লাগিল চরম লাঞ্ছনা ও অপমান। তাহারা ক্রীতদাস বলিয়া গণ্য হইল; স্বাধীনভাবে চলাফেরা অথবা জীবিকা নির্বাহের কোন অধিকারই তাহাদের রহিল না। কোন ইহুদী ক্রীতদাসের পুত্রসন্তান জন্মিলে সরকারী আদেশে তাহাকে নীলনদের জলে ভাসাইয়া দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

মোজেস-এর জন্ম ও বাল্যজীবন—ইহুদীদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে তাহাদের ত্রাণকর্তা **মোজেস** বা **মুসার** উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন এক ক্রীতদাস পরিবারের সন্তান। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাঁহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে—ইহা সকলেই জানিত। কিন্তু মুসার মা সন্তানকে নদীতে ভাসাইয়া দিতে পারিলেন না। নলখাগড়ার একটি ঝুড়িতে

করিয়া তিনি শিশুসন্তানকে রাখিয়া আসিলেন নদীর কিনারায় এক ঝোপের আড়ালে। ফেয়ারোর কন্যা শিশুটিকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার প্রাণরক্ষা এবং লালন পালনের ব্যবস্থা করিলেন। শিশু ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিল। এই সময় মিশরের এক অত্যাচারী নাগরিকের নিষ্ঠুরতা সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে যুবক মুসা তাহার প্রাণনাশ করেন। ইহার পর মিশরে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করিয়া মুসা মিশর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

মুসা বা মোজেসের নেতৃত্বে দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের আশায় ইহুদীদের মিশর ত্যাগ—শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কল্প মুসা কাজে পরিণত করিতে পারেন নাই। দৈববাণী হইল, তাঁহাকে আরও কিছুদিন মিশরে থাকিতে হইবে। ইহার কিছুকাল পরে দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের আশায় মুসা তাঁহার স্বজাতীয়দের লইয়া যাত্রা করিলেন অজানা পথে। বহু কষ্টে লোহিত সাগর এবং মরুভূমি অঞ্চল অতিক্রম করিয়া দলবল লইয়া তিনি পৌঁছাইলেন সিনাই পর্বতের পাদদেশে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে এখানে অবস্থান কালে তিনি দৈববাণী শুনিয়াছিলেন। এই বাণীতে দশটি নির্দেশ রহিয়াছে। এই বাণীর প্রভাবেই ইহুদীরা মূর্তিপূজার
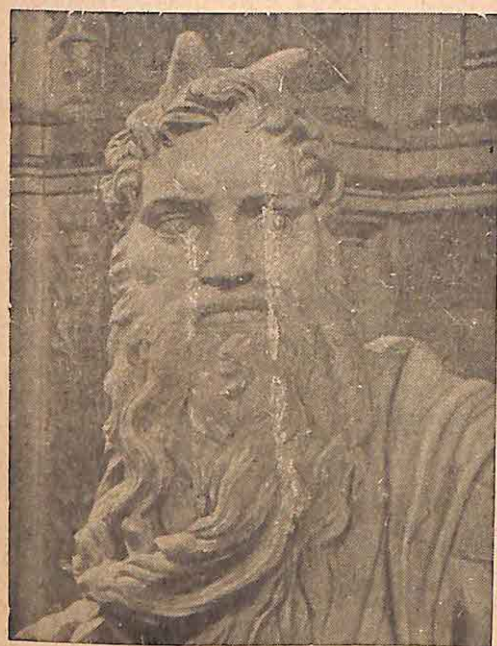
মোজেস (মুসা)

পরিবর্তে গ্রহণ করিল এক অদ্বিতীয় ঐশী শক্তির আরাধনার আদর্শ। এই ঘটনার পর চল্লিশ বছর জীবিত থাকিলেও মুসার জীবদ্দশায় ইহুদীরা কোন স্থায়ী বাসভূমি নির্বাচন করিতে পারে নাই। কিন্তু মুসার নেতৃত্বে এই সরল মেষপালকরা একটি অখণ্ড একপ্রাণ জাতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

ইহুদীরাজ্য প্রতিষ্ঠা—দুর্ভাগ্যক্রমে এই নূতন অঞ্চলেও ইহুদীরা নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে নাই। এখানে তাহাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফিলিস্টাইন জাতি। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের আরও পশ্চিমে সরিয়া যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। লেবানন পর্বতের দক্ষিণ হইতে শুরু করিয়া হেব্রোন পর্যন্ত অঞ্চল জুড়িয়া ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল ইহুদীদের স্বাধীন রাজ্য ইস্রায়েল। এই রাজ্যের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি **ডেভিড**। ইনি প্রতিবেশী ফিলিস্টাইনদের পরাজিত করিয়া জেরুজালেমের দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। ডেভিডের পুত্র **সলোমন**। ইনি পাণ্ডিত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ইহাদের রাজত্বকালে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ এবং মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দিরের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল জেরুজালেমের মন্দির।

সালোমনের মৃত্যুর (খ্রীঃ পূঃ ৯১৬) পর ইহুদী রাজ্য **ইস্রায়েল** এবং জুডা নামক দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যে ভাগ হইয়া যায়। ইহার ফলে ইহুদীদের শক্তি হ্রাস পায় এবং খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে এই দুটি রাজ্য আসিরিয়া সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পরে আসিরিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর এই অঞ্চলে স্থাপিত হয় পারসিকদের প্রভুত্ব।

ওল্ড টেস্টামেণ্ট—প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ দান হিব্রু ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর অন্তর্ভুক্ত **ওল্ড টেস্টামেণ্ট**। এই গ্রন্থটিতে ৩০টি অধ্যায়ে আছে সৃষ্টির আদিম রহস্য, জাতির প্রধান ধর্মগুরুদের বাণী, কাব্য, নীতিকথা, আইনের সঙ্কলন এবং গল্প ও উপাখ্যান। ইহুদীদের একমাত্র উপাস্য দেবতা যেহোভা। যীশু খ্রীষ্টের বাণী সর্বপ্রথম ইহুদীদের মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল।

অনুশীলন

১। লোহার আবিষ্কার সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই আবিষ্কারের ফলে একদিকে জীবনযাত্রা-প্রণালী সহজ এবং সচ্ছলতর হইয়া উঠিয়াছিল, অপরদিকে ইহার ফলে বৃদ্ধি পায় উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদক বা বৃত্তিধারীদের সংখ্যা।

২। পুরাতন প্রস্তর যুগ হইতে শুরু করিয়া প্রথম পর্যায়ের ধাতু যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবনধারায় উন্নতির গতি অব্যাহত ছিল; কিন্তু লোহা আবিষ্কারের ফলে শুধু সমাজ এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিল বিরাট পরিবর্তন। এই যুগ হইতে একদিকে যেমন রাজার অথবা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনই অন্যান্যরা, বিশেষতঃ বিত্তশালী লোকেরা সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের প্রাধান্য আগের তুলনায় বাড়াইয়া তোলার সুযোগ পায়।

(ক) ব্যাবিলন

১। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার পত্তন করে সুমের জাতি। পরে এই অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে আক্কাদ জাতি। আক্কাদদের প্রভুত্ব খর্ব করিয়া আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করিয়া এক অখণ্ড রাজ্য।

২। পূর্বগামীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নূতন শাসকশ্রেণী রাজ্যের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সচেষ্ট ছিলেন। তখনও সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য অব্যাহত ছিল।

৩। ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন হাম্মুরাবি। ইহার রাজত্বকালে প্রচলিত আইনকানুনের সঙ্কলন প্রকাশিত হয়।

(খ) মিশর

১। মিশর শুধু আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রাধান্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকে নাই। মিশরের অধিপতিরা সামরিক শক্তির সাহায্যে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ইহার ফলে পশ্চিম ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগরের নানা অঞ্চলে গড়িয়া উঠে মিশরের বহু সামরিক ঘাঁটি, বাণিজ্যকেন্দ্র ও উপনিবেশ।

২। মিশরে সাম্রাজ্যের যুগেও পুরোহিতদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। পুরোহিতরা অনেক সময় নিজেদের রাজার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে কখনও কখনও

রাজাদের সঙ্গে পুরোহিতরা প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতেন। এই বিরোধের ফলে মিশরের শক্তিহ্রাস এবং পতনের পথ সুগম হয়।

(গ) ইরাণ

১। ইরাণ বা পারস্য প্রাচীন যুগের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে ছিল অগ্রগণ্য। এককালে এই সাম্রাজ্য পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপাঞ্চল হইতে পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে ইরাণের খ্যাতির মূলে রহিয়াছে স্বনামধন্য ধর্মগুরু জরথুস্ত্রের আবির্ভাব। তাঁহার মূল শিক্ষা—অশুভ শক্তির প্রভাব এড়াইয়া মানুষের কর্তব্য, শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সৎ জীবন যাপন করা।

(ঘ) ইহুদী জাতি

১। পশুচারণ এবং মেষপালন ছিল আদিম ইহুদীদের প্রধান বৃত্তি। স্বল্পপরিসর বাসভূমিতে তাহাদের প্রয়োজন মিটিত না। তাই প্রয়োজন পূরণের আশায় তাহারা মিশরে বসবাস করিতে শুরু করে।

২। মিশরের কর্তৃপক্ষ ইহুদীদের সুনজরে দেখিতেন না। নানাভাবে এই আগন্তুকদের নির্যাতন করাই ছিল তাঁহাদের নীতি। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নূতন জীবনের সন্ধান দিলেন মুসা বা মোজেস। তাঁহার নেতৃত্বে ইহুদীরা পরিণতি লাভ করিল এক সংহত, ঐক্যবদ্ধ জাতি রূপে।

প্রশ্নমালা

(ক) ব্যাবিলন

১। সুমেরদের প্রাধান্য খর্ব করিয়া মেসোপোটেমিয়ায় কোন্ জাতি প্রভুত্ব স্থাপন করে?

২। কখন এবং কি ভাবে মেসোপোটেমিয়ায় ব্যাবিলনের প্রাধান্য স্থাপিত হয়?

৩। ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে কে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন?

৪। রাজা হাম্মুরাবি কি জন্য প্রসিদ্ধ?

৫। ব্যাবিলনের একটি মন্দির বর্ণনা কর।

৬। ব্যাবিলনের কয়েকটি দেবদেবীর নাম উল্লেখ কর।

৬ গ্রীস

ক্রীট-সভ্যতার প্রভাব—ইউরোপ মহাদেশের যে অঞ্চলটিতে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটিয়াছিল তাহার নাম গ্রীস। অবশ্য গ্রীসের এই সভ্যতার মূলে ছিল ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ঈজিয়ান দ্বীপাঞ্চলের পূর্বতন সভ্যতার অনেকখানি প্রভাব।

ঈজিয়ান দ্বীপাঞ্চল ও প্রাচীন গ্রীস

মেসোপোটেমিয়া হইতে সভ্যতা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া এশিয়া মাইনরে কি ভাবে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই অগ্রগতি এশিয়া মাইনরেই স্তব্ধ হইয়া থাকে নাই। ক্রমে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ইহা প্রসারিত হইল আরও পশ্চিমে অবস্থিত দ্বীপাঞ্চলে। এশিয়া মাইনরের

(খ) মিশর

৭। মিশরের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল ? পরে উহা কোথায় স্থানান্তরিত হয় ?

৮। মিশরের অন্ততঃ তিনজন ফেয়ারোর নাম বল।

৯। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মিশরীদের কি ধারণা ছিল ?

১০। মিশরীদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কি জান ?

১১। কোন্ কোন্ অঞ্চলে মিশরের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল ?

(গ) ইরাণ

১২। নীচে কয়েকজন পারস্য সম্রাটের নাম দেওয়া আছে ; সময়-সীমা অনুসারে এই নামগুলি পরপর সাজাও :

জারেক্সেস্, কাম্বিসেস, প্রথম দারায়ুস, কুরুষ।

১৩। কোন্ পারস্য সম্রাট সর্বপ্রথম ভারত-সীমান্তের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করিয়াছিলেন ?

১৪। পারস্যের বাহিরে পারস্য সম্রাটরা কোন্ কোন্ দেশ জয় করিয়াছিলেন ?

১৫। জরথুস্ত্র কে ছিলেন ? তাঁহার ধর্মনীতির মূল বক্তব্য কি ছিল ?

(ঘ) ইহুদী জাতি

১৬। ইহুদীদের প্রথম বাসভূমি কোথায় ছিল।

১৭। মিশরে ইহুদীরা কি অবস্থায় জীবন যাপন করিত ?

১৮। মূসা কে ছিলেন ? তাঁহার জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৯। মূসার প্রধান কীর্তি কি ?

২০। ওল্ড টেস্টামেণ্টে কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে ?

———

পশ্চিম উপকূল এবং গ্রীস উপদ্বীপের মধ্যে রহিয়াছে ঈজিয়ান সমুদ্র এই সমুদ্রের নানা জায়গায় ছড়ানো রহিয়াছে কতকগুলি দ্বীপ। এই সকল দ্বীপের মধ্যে সব চাইতে নামকরা দ্বীপ ক্রীট। এই দ্বীপেই সুপ্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ। এই সভ্যতা ছিল মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার সমসাময়িক। এখানকার জমি ছিল উর্বর। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষি ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যেও দক্ষ ছিল। প্রতি বৎসর জলপাই তেল, সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত পাত্র, ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পণ্য বোঝাই করিয়া ক্রীটের জাহাজ একদিকে মিশর, অপরদিকে ইটালি এবং সিসিলি দ্বীপে পাড়ি জমাইত; ফিরিয়া আসিত সোনা, রূপা, তামা, হাতির দাঁত এবং খাদ্য-শস্য লইয়া। এই ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলে ক্রীটের অধিবাসীরা সচ্ছল জীবন যাপন করিত।

ক্রীটের শিল্প

মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীদের মতো ক্রীটের বাসিন্দারাও সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে লেখাপড়ার কাজ চালাইত। নানা ধরনের সুদৃশ্য পাত্র তৈয়ারীর কৌশলও তাহাদের জানা ছিল।

মহাকাব্যের যুগে গ্রীস—ক্রীটের এই সভ্যতা ক্রমে এশিয়া মাইনরের অন্তর্ভুক্ত ট্রয় নগরে প্রসার লাভ করে। আরও পরে এই সভ্যতা ছড়াইয়া পড়ে দক্ষিণ গ্রীসের অন্তর্গত **মাইসিনি** এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (খ্রীঃ পূঃ ১৬০০)। ট্রয় নগরের কাহিনী লইয়া গ্রীসের মহাকবি **হোমার** রচনা করিয়াছিলেন দুটি অমর মহাকাব্য— ইলিয়াড ও ওডিসি।

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ, মহাভারত হইতে সে যুগের সমাজ,

রীতিনীতি, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারি, হোমারের মহাকাব্য দুটির সাহায্যেও তেমনই আমরা জানিতে পারি প্রাচীন গ্রীসের জনসাধারণের জীবনযাত্রা-প্রণালী, সামাজিক আচার-ব্যবহার, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক সংগঠনের কথা।

প্রাচীন যুগে গ্রীস ছিল বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। প্রতিটি রাজ্যে শাসন করিতেন একজন রাজা। জ্ঞানী ও বয়স্ক লোকদের মধ্য হইতে মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তি রাজাকে পরামর্শ দিতেন। গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়ার আগে অনেক সময় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতামতও যাচাই করা হইত।

পরিবারের যিনি প্রধান তিনিই ছিলেন পরিবারের সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু জমিজমার উপর পরিবারের সকলের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইত। কোন এক ব্যক্তি জমির মালিক হইতে পারিতেন না। কেহ কোন অন্যায় করিলে পরিবারই তাহার শাস্তি বিধান করিত। শিল্পবাণিজ্যের দিক হইতে গ্রীকরা উন্নত ছিল। প্রাচীন যুগ হইতেই তাহারা সমুদ্রপথে দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিত। জলদস্যুতা সেকালে ঘৃণ্য বলিয়া গণ্য হইত না।

রাজপদ প্রথমে বংশানুক্রমিক ছিল। রাজা একাধারে প্রধান শাসক, প্রধান বিচারপতি এবং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিতেন। হোমার-বর্ণিত যুগের শেষ ভাগে কোন কোন অঞ্চলে রাজপথ লোপ পাইয়া গঠিত হয় অভিজাততন্ত্র। নূতন শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন মুষ্টিমেয় সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা।

নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব—পরবর্তী কালে নগরের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসে গড়িয়া উঠিল অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্র। এই সকল রাষ্ট্র আয়তনে ছিল ছোট। জনসংখ্যাও ছিল সীমিত। তাই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাইত। ইহার ফলে অভিজাততন্ত্রের স্থলে গ্রীসের বহু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইল গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল **এথেন্স**।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান—বহু নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠার ফলে সমগ্র গ্রীসদেশ জুড়িয়া বহুকাল পর্যন্ত একটি অখণ্ড রাজ্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই। ছোট ছোট অনেকগুলি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন রাজ্য গঠিত হওয়ার ফলে গ্রীসদেশে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। কিন্তু এ কথা মানিয়া লইলেও, গ্রীসের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ ছিল না—এ কথা বলা যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকগুলি কারণে ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে কোন রাষ্ট্রের প্রজাই হোক না, প্রত্যেক গ্রীসবাসী বিশ্বাস করিত যে তাহারা সকলেই একই পূর্বপুরুষের বংশধর। কিংবদন্তীর এই পূর্বপুরুষের নাম ছিল হেলেন। এই জন্য গ্রীস দেশের প্রাচীন নাম হেলাস; গ্রীকরাও 'হেলেনিজ' নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক গ্রীসবাসীর মধ্যে একই রক্তধারা প্রবাহিত—এই বিশ্বাস রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকের মনে জাগাইয়া তুলিত এক নিবিড় ঐক্যবোধ। তাছাড়া হোমারের মহাকাব্য ছিল গ্রীকদের কাছে জাতীয় সাহিত্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রজা হইলেও তাহারা সকলে একই ভাষায় কথাবার্তা বলিত। বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হইয়া সর্বজনীন ক্রীড়া-উৎসবে যোগদান করিত। তাহারা সকলেই একই দেবদেবীর উপাসনা করিত। প্রতি বৎসর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দেবমন্দিরগুলি দর্শন করা তাহারা পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। সুতরাং পরস্পরের সহিত মেলামেশার সুযোগের মাধ্যমে গ্রীকদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল গভীর ও দৃঢ় ঐক্যবোধ।

উপনিবেশ বিস্তার—গ্রীসদেশের তিন দিক ঘিরিয়া সমুদ্র উপকূল-ভাগও ভাঙ্গাচোরা। সমুদ্রের জল এই সব রন্ধ্রপথে দেশের অভ্যন্তর ভাগের অনেকখানি পর্যন্ত সহজেই পেঁছাইত। গ্রীসের কোন অঞ্চলই সমুদ্র হইতে ৪০ মাইলের বেশী দূরে অবস্থিত নয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীকদের করিয়া তুলিয়াছিল এক সমুদ্রাশ্রয়ী জাতি। তাছাড়া পর্বতসঙ্কুল হওয়ার ফলে গ্রীসের জমির উর্বরতা খুব বেশী ছিল না। জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য ছিল অপ্রচুর। সর্বোপরি গ্রীকদের চরিত্রের প্রধান

বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাদের দুঃসাহসিক মনোভাব। অজানাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অদম্য। এই সকল কারণে গ্রীস দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেক সময় নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পাড়ি দিত সামুদ্রিক অভিযানে। বিদেশে বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থলাভের ইচ্ছাও গ্রীকদের মনে বিদেশ যাত্রার প্রেরণা যোগাইত। এই কারণে প্রাচীন যুগ হইতেই ভূমধ্যসাগরের দ্বীপাঞ্চলে এবং ভূমধ্যসাগর ছাড়াইয়া একদিকে আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনর এবং অপর দিকে ইটালি ও সিসিলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল বহুসংখ্যক গ্রীক উপনিবেশ। উপনিবেশ-গুলি শুধু বাণিজ্যের ঘাঁটিই ছিল না, গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপেও ইহারা অর্জন করিয়াছিল অসাধারণ খ্যাতি। এই সকল উপনিবেশের মাধ্যমেই ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতার প্রসার সম্ভব হইয়াছিল।

এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা—প্রাচীন গ্রীসদেশের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে **এথেন্স ও স্পার্টা**—এই দুই রাষ্ট্র খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দিক হইতে ছিল শীর্ষস্থানে। এথেন্স অবস্থিত ছিল মধ্য গ্রীসে, স্পার্টা ছিল দক্ষিণ গ্রীসে। এই দুটি রাষ্ট্র একই দেশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের দিক হইতে ইহাদের অধিবাসীদের মধ্যে কোন দিক দিয়াই মিল ছিল না। স্পার্টায় সামরিক শিক্ষা ও শক্তিচর্চার উপর আরোপ করা হইত সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সরকারী কর্মীরা তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেন। তাঁহারা যদি মনে করিতেন যে শিশুটি ভবিষ্যতে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে না, তাহা হইলে সেই শিশুটিকে মা-বাবার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া নির্জন পাহাড়ে রাখিয়া দেওয়া হইত। হতভাগ্য শিশু সেখানেই অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারাইত। সুস্থ বালকদের সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার কাছে থাকিতে দেওয়া হইত। পরে তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার ন্যস্ত হইত সরকারী কর্মচারীদের উপর। শারীরিক উৎকর্ষই ছিল স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার্থী বালকরা যাহাতে সবল ও কর্মঠ হইতে পারে সেই জন্য তাহাদের

শিখানো হইত নানা ধরনের সামরিক কসরৎ ও কষ্ট সহ্য করার মতো ক্ষমতা। ২০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের পক্ষে সামরিক শিবিরে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। এই সময় তাহাদের বিবাহের অনুমতিও দেওয়া হইত। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে তাহাদের নিজ নিজ পরিবারের সহিত বসবাসের অনুমতি দেওয়া হইত না।

স্পার্টার মেয়েদের পক্ষেও শরীরচর্চা, খেলাধূলা বাধ্যতামূলক ছিল। এই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল যাহাতে স্পার্টার প্রতিটি নাগরিক সামরিক দিক দিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে পারে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনের কোন স্থান ছিল না।

স্পার্টায় রাজতন্ত্রী শাসন প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন রাজা। স্পার্টার শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, রাজা ছিলেন একজনের পরিবর্তে দু'জন। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। মাত্র দুটি পরিবারের লোক রাজপদলাভ করিতে পারিতেন। রাজারা ছিলেন প্রধান বিচারক এবং প্রধান পুরোহিত। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারাই সামরিক বাহিনীকে নেতৃত্ব দান করিতেন।

রাজারা কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। শাসনকার্যে রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ছিল এক উপদেষ্টা পরিষদ। দু'জন রাজা ছাড়া ৬০ বৎসর এবং তাহার বেশী বয়সের ২৮ জন প্রবীণ ব্যক্তিদের লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইত। তাছাড়া ছিল একটি জন-পরিষদ। ত্রিশ বৎসর এবং তাহার বেশী বয়সের নাগরিকরা এই পরিষদের সভ্য হইতে পারিতেন। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত।

রাজা, উপদেষ্টা-সমিতি এবং জন-পরিষদ ছাড়াও স্পার্টার শাসনতন্ত্রের আরও একটি অঙ্গ ছিল। বিশেষ এক শ্রেণীর পাঁচ জন ব্যক্তি ছিলেন এই ক্ষমতার অধিকারী। ইহাদের বলা হইত এফোর্। কোন কোন বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালনায় ইহাদের ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতা। দু'জন এফোর্ যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সঙ্গী হইতেন। রাজারা যাহাতে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পারেন সেদিকে তাঁহারা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি

রাখিতেন। প্রয়োজন বোধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অপরাধে তাঁহারা রাজাদের অভিযুক্ত করিতে পারিতেন।

সুতরাং স্পার্টার শাসনতন্ত্রের শীর্ষস্থানে রাজা থাকিলেও স্পার্টা পুরাপুরি রাজতন্ত্র-শাসিত দেশ ছিল না। উপদেষ্টা-সমিতি, জনপরিষদ এবং এফোর্‌রা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে শাসন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন। অবশ্য জনসাধারণ বলিতে সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষকে বুঝাইত না। স্পার্টার জনসাধারণ ছিল তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু সমাজে সংখ্যার দিক হইতে যাহারা গরিষ্ঠ ছিল তাহাদের ভাগ্যে নাগরিক অধিকার জুটিত না। ধনী ব্যক্তিদের জমি চাষ করিয়া তাহাদের অন্নের সংস্থান করিতে হইত। এই কারণে রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্য খুব দৃঢ় ছিল না। স্পার্টার শাসকশ্রেণী ইহাদের গতিবিধির উপর সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা মাত্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহা দমনের ব্যবস্থা করিতেন।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ—এথেন্স ছিল স্পার্টার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল উদার। শুধু মাত্র সামরিক বৃত্তির বিকাশ এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল না। সব দিক দিয়া এথেন্সবাসীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটুক—ইহাই ছিল এখানকার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। এই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের একদিকে যেমন সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত, অপর দিকে তেমনি সঙ্গীত, কাব্য, নাট্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি আয়ত্ত করিতেও তাহাদের উৎসাহিত করা হইত। এই কারণে স্পার্টার মতো এথেন্স শুধু মাত্র সামরিক শিবির হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই; এখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বহু বিখ্যাত কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং ভাস্কর্যশিল্পী। ইঁহাদের রচনা ও শিল্পকীর্তি আজও পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে।

স্পার্টার মতো এথেন্সেও এক কালে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। পরে রাজতন্ত্রের অবসানে এখানে স্থাপিত হয় অভিজাততন্ত্র, অথবা সম্ভ্রান্ত ধনী

ব্যক্তিদের অধীনে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। কিছুকালের জন্য এথেন্সে একনায়কতন্ত্রও প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এথেন্সবাসীরা বাছিয়া লইল গণতন্ত্রের আদর্শ। এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক ছিলেন **সোলন** নামে এক পরম জ্ঞানী ব্যক্তি। নিজে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও শুধু নিজেদের গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা না রাখিয়া তিনি তাহা জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক নূতন শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। পরে সোলনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া **ক্লাইস্থিনিস** নামে এক নেতা জনসাধারণকে আরও ক্ষমতা দিয়া শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। আরও পরে এথেন্স-এর স্বনামধন্য নেতা **পেরিক্লিস**-এর নেতৃত্বে প্রবর্তিত হয় পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এথেনীয় পিতামাতার সন্তান বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিতে পারিতেন তাঁহারা সকলেই নাগরিকত্বের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে পারিতেন।

এথেনীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত নয় জন শাসনকর্তা। ইহাদের বলা হইত **আর্কন**। এ ছাড়া ছিল ৫০০ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি সমিতি। তাছাড়া ছিল জন-পরিষদ। সর্বোচ্চ বিচারক্ষমতা ন্যস্ত ছিল জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাও যাহাতে শাসন-কার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য সকলকে রাষ্ট্র-সেবার বিনিময়ে বেতন দেওয়া হত।

পেরিক্লিস

পেরিক্লিস—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এথেন্সের নাগরিকদের পক্ষে শুধু প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করাই সম্ভব হয় নাই, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের উপযোগী পরিবেশও তাহাদের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল। পেরিক্লিস যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

ছিলেন (৪৬১-৪৩০ খ্রীঃ পূঃ) তখন এথেনীয় গণতন্ত্র ও সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। এই যুগকে বলা হয় গ্রীসের স্বর্ণযুগ।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পেরিক্লিস্ ছিলেন গ্রীসদেশে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ। পিতা জেনথিপাস ছিলেন সে-যুগের নামকরা সেনাপতি। সমসাময়িক যুগের খ্যাতনামা দুই মনীষী এনাক্সাগোরাস এবং জেনোর নিকট পেরিক্লিস বাল্যকালে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি গণতন্ত্রী দলের নেতারূপে এথেনীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারের পদ লাভ করেন। একদিকে জলপথে এথেন্সের প্রাধান্য ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং অন্যদিকে পূর্ণ গণতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াই পেরিক্লিস ক্ষান্ত হন নাই; শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য, সকল বিষয়ে এথেন্সকে গ্রীসের মধ্যমণি করিয়া তুলিতেও তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এথেন্স গ্রীসের শিক্ষাগুরুরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

এথেন্সের দেবী এথেনা ও দেব পজিডন

এথেন্সের স্বর্ণযুগ—পেরিক্লিসের যুগে নানাদিক দিয়া এথেন্স আরোহণ করিয়াছিল খ্যাতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে। পেরিক্লিসের ক্ষমতা লাভের আগেই এথেন্সের খ্যাতির সূচনা দেখা দিয়াছিল। পারস্যের সম্রাট দারায়ূস এবং জারেক্সেস-এর মতো দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীররা বারবার গ্রীস আক্রমণ করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই অসাফল্যের মূলে ছিল প্রধানতঃ এথেন্সের সবল প্রতিরোধ। গ্রীকজাতির এই চরম বিপদের দিনে এথেন্স যে ভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল সেজন্য

গ্রীকজাতি এথেন্সকেই বরণ করিয়াছিল তাহাদের নেতা রূপে। পেরিক্লিস যখন ক্ষমতা লাভ করেন তখন এথেন্স-এর নৌবহর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পেরিক্লিস এই নৌবলের সাহায্যে এথেন্স-এর রাজনৈতিক শক্তি এবং বাণিজ্যিক তৎপরতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে এথেন্সে স্থাপিত হইয়াছিল পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত শাসন-ব্যবস্থা।

সাহিত্য ও শিল্প—তাছাড়া সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক হইতেও এই সময়ে ঘটিয়াছিল এথেন্সের সর্বাধিক উন্নতি। এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী বহু সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক।

এই সময়ের স্থাপত্যকীর্তি রূপে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এথেন্স-এর **পার্থেনন** মন্দির। এই মন্দিরে দেবতা জিউস এবং দেবী এথেনার মূর্তি দু'টি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ধর্মবিশ্বাস—প্রাচীন যুগে গ্রীসের অধিবাসীরা বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, দেবতারা মানুষের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। অনেক সময় সাধারণ নরনারীর রূপ ধারণ করিয়া দেবতারা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অংশীদার হইতেন। দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ এবং বলিদানের দায়িত্ব পালন করিতেন পুরোহিতরা।

সক্রেটিস

সফোক্লেস—পেরিক্লিস-যুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দান নাট্যসাহিত্যের। এই যুগের নাট্যকারদের অন্যতম ছিলেন **সফোক্লেস**। ইনি অন্ততঃ ১১৩টি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

সক্রেটিস—এই যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবী-বিখ্যাত দার্শনিক **সক্রেটিস**। তিনি সত্যের পূজারী ছিলেন। সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তাধারা এবং যুক্তিবাদের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিতেন। প্রচলিত বহু সামাজিক রীতি-নীতি এবং ধর্মীয় আচরণ তিনি অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতেন। স্বাধীন মতবাদের এই

পূজারী শেষ পর্যন্ত সরকারী আদেশে বিষপান করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। এই আত্মাহুতি দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বর্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ শ্রেয়ঃ।

হেরোদোতাস ও থুকিদিদিস—এই যুগের ঐতিহাসিক **হেরোদোতাস** ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ছিলেন পথিকৃৎ। ইনি রচনা করিয়াছিলেন পারসিক

হেরোদোতাস

থুকিদিদিস

বনাম গ্রীকদের যুদ্ধের ইতিহাস। এই যুগের শেষের দিকে স্পার্টা বনাম এথেন্স-এর যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন **থুকিদিদিস**।

স্পার্টা বনাম এথেন্স ঃ এথেন্সের পতন—সামরিক দিক হইতে প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্পার্টাকে সকলেই গ্রীসের নেতা হিসাবে মানিয়া চলিত। পারসিকরা যখন গ্রীস দেশ আক্রমণ করে তখনও স্পার্টার নেতৃত্বেই গ্রীসবাসীরা শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু দেশের এই ঘোরতর বিপদের দিনে দেখা গেল যে দক্ষিণ গ্রীসের নিরাপত্তা লইয়াই স্পার্টার কর্তৃপক্ষের চিন্তাভাবনা ছিল বেশী। এই অবস্থায় এথেন্স সর্বস্ব পণ করিয়া যে ভাবে এই চরম বিপদে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিরোধ রচনা করে তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী পারস্য গ্রীস জয়ের আকাঙ্ক্ষা সফল করিতে পারে নাই।

এথেন্সের এই খ্যাতি ও শক্তি স্পার্টার পছন্দ হয় নাই। নানা বিষয় লইয়া হু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে দেখা গেল স্বার্থের বিরোধ। শেষ পর্যন্ত উভয়ের

মধ্যে শুরু হইল যুদ্ধ। ২৭ বৎসর (৪৩১-৪০৪ খ্রীঃ পূঃ) ধরিয়া, অনবরত যুদ্ধ না হইলেও, ইহারা পরস্পরকে শত্রু বলিয়া মনে করিত। শেষ পর্যন্ত নিজেদের চেষ্টায় এথেন্সের শক্তি খর্ব করা সম্ভব নয়—ইহা বুঝিতে পারিয়া স্পার্টা পারস্যের সহিত একযোগে এথেন্স আক্রমণ করিল। এই দুটি প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আঁটিয়া উঠা এথেন্সের সাধ্যায়ত্ত হইল না। এথেন্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্যের অবসানে প্রতিষ্ঠিত হইল স্পার্টার প্রভুত্ব। এথেন্স বিভিন্ন রাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে গিয়া গ্রীসবাসীর মনে অনেকখানি অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিকে এথেন্সের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ, অপর দিকে স্পার্টা ও পারস্যের সম্মিলিত বিরোধিতা—এই দুটি কারণেই এথেন্সের প্রাধান্যের অবসানে স্থাপিত হয় স্পার্টার প্রভুত্ব।

ম্যাসিডন-এর প্রাধান্য—এথেনীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর কিছুদিন ধরিয়া পুনঃস্থাপিত হয় স্পার্টার নেতৃত্ব। এই প্রাধান্যও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অতঃপর কয়েক বৎসর গ্রীসের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে থীব্‌স্ রাষ্ট্র। ইহার পর গ্রীস দেশের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় ম্যাসিডনে। এই রাজ্যের প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপন করেন ম্যাসিডন-রাজ **ফিলিপ**।

আলেকজাণ্ডার

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান—ফিলিপের পুত্র ভুবনবিজয়ী বীর **আলেকজাণ্ডার** সমস্ত গ্রীস জয় করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া তিনি সমস্ত পারস্য সাম্রাজ্য পদানত করেন। ইহাতেও তাঁহার রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই। অতঃপর আলেকজাণ্ডার কান্দাহারের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বহু রাজাকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। আবার কোন কোন ভূখণ্ডের রাজা বিনাযুদ্ধেই তাঁহার বশ্যতা মানিয়া লন। এই সময়ে পাঞ্জাবের

বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন পুরুরাজ। ইনি বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে চালনা করেন প্রচণ্ড যুদ্ধ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত

তিনি পরাজিত হইলেন। বিজয়ী ম্যাসিডন-রাজ আরও রাজ্য জয় করার
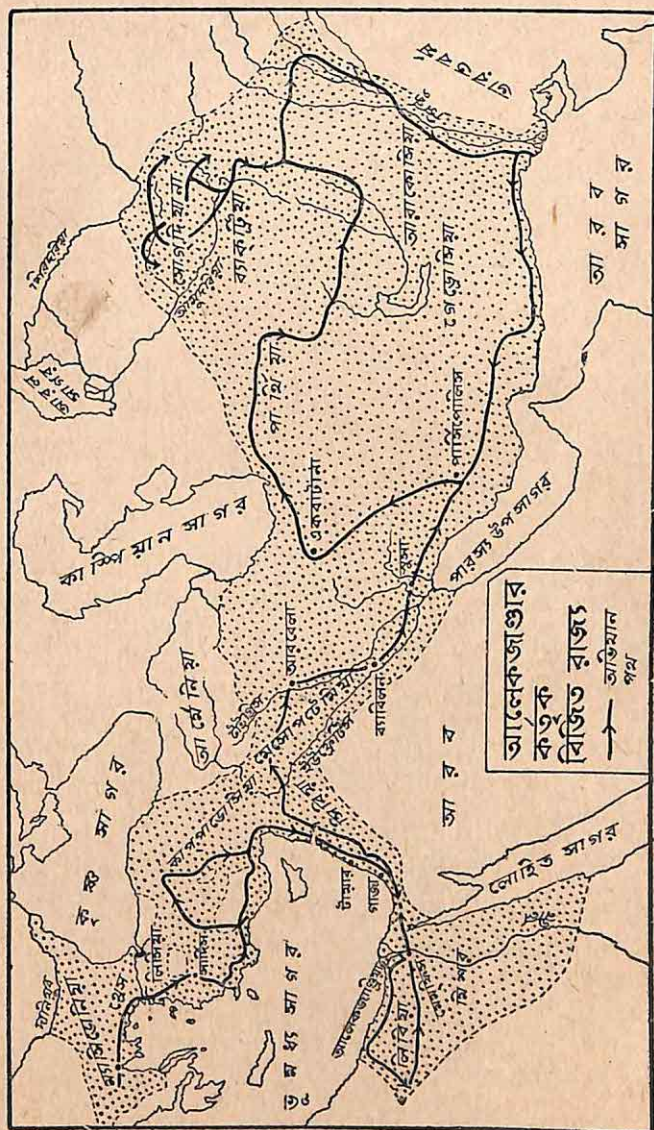
ইচ্ছায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও আলেকজাণ্ডার তাহাদের মতের পরিবর্তন ঘটাইতে পারিলেন না। অগত্যা ভারত-জয়ের সঙ্কল্প অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।

স্বাধীনতা লোপ—খণ্ড বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও গ্রীস দেশ আরও একশত বৎসর স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোমের সামরিক শক্তির কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে গ্রীসের স্বাধীনতার বিলোপ ঘটে (খ্রীঃ পূঃ ২০০)।

অনুশীলন

১। ইউরোপ মহাদেশে সভ্যতার বিকাশ ঘটে সর্বপ্রথম গ্রীস দেশে। গ্রীকদের এই সভ্যতার মূলে ছিল ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ঈজিয়ান দ্বীপের প্রাচীনতম সভ্যতার প্রভাব। এই সভ্যতা ক্রমে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া গ্রীসের দক্ষিণ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। ইহার ফলে সমগ্র গ্রীস জুড়িয়া গড়িয়া উঠে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বনিয়াদ।

২। গ্রীসদেশের সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ইলিয়াড এবং ওডিসি নামে পরিচিত দু'টি মহাকাব্যে। এই দু'টি অমর গ্রন্থের রচয়িতা মহাকবি হোমার।

৩। গ্রীসদেশে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না; সমগ্র দেশটি বিভক্ত ছিল অনেকগুলি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র রাজ্যে। কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে গ্রীক জাতির মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল এক গভীর, অচ্ছেদ্য ঐক্যবোধ।

৪। গ্রীসদেশের রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দু'টি রাষ্ট্র—স্পার্টা ও এথেন্স। তবে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা কোন দিক হইতেই ইহাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। স্পার্টায় ছিল রাজতন্ত্রী শাসন আর এথেন্স ছিল গণতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্র। স্পার্টা ছিল একটি সামরিক শিবির মাত্র, যেখানে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক

নাগরিককে সামরিক শিক্ষাদীক্ষার দিক হইতে প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধারূপে গড়িয়া তোলা। এথেন্সের কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিলেন ব্যক্তিত্বের সর্বাত্মক উন্নতির সহায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থা।

৫। স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন ছিল না। স্পার্টা দক্ষিণ গ্রীসের নেতৃত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। এথেন্সের ছিল প্রচণ্ড নৌবল। এই নৌবলের সাহায্যে এথেন্স কিছুদিনের মধ্যেই একদিকে বাণিজ্য এবং অপরদিকে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনে অর্জন করে বিরাট সাফল্য।

৬। দীর্ঘকাল ধরিয়া এথেন্স-রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন পেরিক্লিস। এথেন্সের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক প্রাধান্য লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। এথেন্সকে সমগ্র গ্রীসের 'সাংস্কৃতিক পীঠস্থান'রূপে গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। এই সময়ে এথেন্সে আবির্ভূত হন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বহু মনীষী। ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নাট্যকার সফোক্লেস, দার্শনিক সক্রেটিস এবং ঐতিহাসিক হেরোদোতাস ও থুকিদিদিস। পেরিক্লিসের যুগ প্রাচীন 'গ্রীসের স্বর্ণযুগ' নামে প্রসিদ্ধ।

৭। গ্রীসের অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। নিজেদের নগর-রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার উপর তাহারা আরোপ করিত সর্বাধিক গুরুত্ব। এই কারণে এথেন্সের রাজনৈতিক প্রাধান্য অনেকেই মনে প্রাণে অপছন্দ করিত। স্পার্টা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এথেন্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত স্পার্টা পারস্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া একযোগে এথেন্সকে আক্রমণ করিলে এথেন্স পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল (৪০৪ খ্রীঃ পূঃ)। ইহার ফলে এথেন্সের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

৮। সমগ্র গ্রীস জুড়িয়া বহুদিন পর্যন্ত কোন একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নাই। তবু প্রথমে অন্যান্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে স্পার্টাই ছিল নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র। পরে এথেন্স যেভাবে সমস্ত শক্তি পণ করিয়া পারসিক আক্রমণ প্রতিহত করে তাহার ফলে গ্রীস দেশে স্পার্টার পরিবর্তে স্থাপিত হয় এথেন্সের নেতৃত্ব। কিন্তু এথেন্সের প্রাধান্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্পার্টা ও পারস্যের সম্মিলিত আক্রমণে এথেন্স পরাজিত হওয়ার পর কিছুকাল স্পার্টার নেতৃত্ব পুনরায় স্বীকৃতি লাভ করে। ইহার কিছুকাল পরে প্রতিষ্ঠিত হয় থীবস্-এর নেতৃত্ব। থীবস্-এর পর গ্রীসের নেতৃত্ব লাভ করে ম্যাসিডন।

৯। ম্যাসিডনের নেতৃত্বে সমগ্র গ্রীস একটি রাজশক্তির অধীনে আনীত হয়। ম্যাসিডনের এই প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ফিলিপ।

১০। ফিলিপের পুত্র ছিলেন ভুবনবিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার। তাঁহার নেতৃত্বে ম্যাসিডনের আধিপত্য গ্রীস অতিক্রম করিয়া ব্যাপ্তি লাভ করে পারস্যে, এশিয়া মাইনরে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের কতক অংশে। ম্যাসিডনের এই প্রাধান্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। পরে ম্যাসিডন এবং অন্যান্য রাজ্যকে পরাজিত করিয়া গ্রীসে প্রতিষ্ঠিত হয় রোমের শাসন।

প্রশ্নমালা

১। উত্তর দাও :—

(ক) গ্রীকরা কোন্ দেশ বা অঞ্চল হইতে গ্রীসদেশে আসিয়াছিল ?

(খ) গ্রীস দেশ কি কারণে 'হেলাস' নামে পরিচিত ছিল ? গ্রীকদের কি জন্য 'হেলেনিজ' বলা হইত ? (গ) সভ্যতর জীবনযাপন-প্রণালী গ্রীকরা কাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছিল ?

২। ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি শহরের নাম লেখ।

৩। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও গ্রীক জাতির মধ্যে কি কি কারণে ঐক্যবোধ জাগ্রত ছিল ?

৪। গ্রীকরা কি কারণে গ্রীসের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল ?

৫। এগুলি সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ :—বৃহত্তর গ্রীস, আর্কন, এফোর, নগর-রাষ্ট্র।

৬। ইহারা কি জন্য বিখ্যাত : সোলন, পেরিক্লিস, হেরোদোতাস, থুকিদিদিস ?

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) —সভ্যতা ক্রমে এশিয়া মাইনরের অন্তর্ভুক্ত — নগরে প্রসার লাভ করে। (খ) গ্রীসদেশের — দিক ঘিরিয়া সমুদ্র। (গ) প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে খ্যাতি প্রতিপত্তির দিক হইতে — ও — এই দুটি রাষ্ট্র ছিল শীর্ষস্থানে। (ঘ) স্পার্টায় — শাসন প্রচলিত ছিল। (ঙ) — ছিল স্পার্টার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৮। পেরিক্লিস-এর কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৯। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন ? তিনি কি কি দেশ জয় করেন ? ভারতবর্ষে তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন ?

৭ রোম
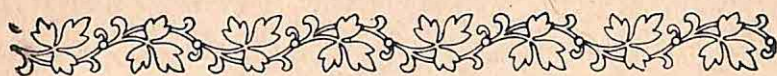
প্রাচীন ইউরোপে শিক্ষাদীক্ষায়, সংস্কৃতি-সভ্যতায় গ্রীস যেমন শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, সামরিক শক্তিতে, সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে তেমনিই রোম ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

রোম-এর উত্থান—কিংবদন্তীর মতে রোমের পত্তন করেন রোমুলাস (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩)। তাঁহার নাম অনুসারে রোম নগরটির নামকরণ হয়। রোমুলাস-এর পর ছয়জন রাজা রোমে পরপর রাজত্ব করেন। শেষ রাজা ছিলেন অতিশয় অত্যাচারী। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহী প্রজারা শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বিতাড়িত করে এবং রাজতন্ত্রের অবসানে রাজার ক্ষমতা ন্যস্ত করে **কন্সাল** উপাধিধারী দুই ব্যক্তির উপর। এই ভাবে রোমে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণতন্ত্রী শাসন (খ্রীঃ পূঃ ৫১০)।

রোম নগরীর পত্তনের পর হইতেই এখানে ক্রমশঃ লোকজনের বসতির এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে। ক্রমে রোমের শাসকরা সামরিক বলের সাহায্যে তাঁহাদের প্রভুত্ব ইটালির অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতি সফল হওয়ার ফলে ইটালির সর্বত্র এবং ভূমধ্যসাগরের কোন কোন দ্বীপে রোমের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

রোম-কার্থেজ সংঘর্ষ—রোমের প্রাধান্য বিনা যুদ্ধে স্থাপিত হয় নাই। ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে রোমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল **কার্থেজ**। এই নগরটি অবস্থিত ছিল আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে। এটি ছিল ফিনিশীয়দের প্রধান ঘাঁটি। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া ফিনিশীয়রা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাহাদের দখলে ছিল অসাধারণ শক্তিশালী নৌ-বাহিনী। বাণিজ্যে এবং নৌ-শক্তিতে বলীয়ান কার্থেজ ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া স্থাপন করিয়াছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। রোম এবং কার্থেজ উভয়েই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করিয়া

চলার ফলে তাহাদের মধ্যে দেখা দিল স্বার্থের বিরোধ। ইটালির দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সিসিলি দ্বীপের আধিপত্য লইয়া উভয় শক্তির মধ্যে শুরু হয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়া এই দুটি দেশ ছিল পরস্পরের সমকক্ষ। সুতরাং দীর্ঘ দিন ধরিয়া ইহাদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা চলিয়াছিল। কার্থেজ বাহিনীর নায়ক ছিলেন প্রথমে **হ্যামিলকার বার্কা** এবং পরে তাঁহার পুত্র **হ্যানিবল**। হ্যানিবল ছিলেন প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর-নায়ক। তিনি যে ভাবে বিরাট সৈন্যদল লইয়া স্থলপথে পিরীনিজ ও আল্পস-এর দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ইটালিতে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা এক অসামান্য সামরিক কীর্তি। রোমের সৈন্যবাহিনীতেও যোগ্য নায়কের অভাব ছিল না। রোমের সৈন্যদল যে ভাবে এক মন এক প্রাণ হইয়া যুদ্ধ চালনা করিয়াছিল তাহার ফলে প্রথম দিকে সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রোমই চূড়ান্ত জয়ের অধিকারী হয়। বিজয়ী রোম-বাহিনী ইতিহাস-খ্যাত কার্থেজ নগরী অধিকার করিয়া উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬)

সমাজ-ব্যবস্থা—রোমে সাধারণতন্ত্রী শাসন স্থাপিত হইলেও এখানকার অধিবাসীরা সকলে সমান অধিকার ভোগ করিত না। রোমের সমাজ প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁহারা পরিচিত ছিলেন **প্যাট্রিসিয়ান** নামে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের লইয়া এই শ্রেণীটি গঠিত ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণী গঠিত ছিল **প্লিবিয়ানদের** লইয়া। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লোকেদের বংশগত কৌলীন্য ছিল না। ইহারা অর্থ-সম্পদেরও অধিকারী ছিল না। কোন কোন বিষয়ে নাগরিক অধিকার পাইলেও রাষ্ট্রের অধীন সব ধরনের চাকুরীতে ইহারা নিযুক্ত হইতে পারিত না। জমির মালিকানা সম্পর্কেও ইহাদের নানা ধরনের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইত।

প্লিবিয়ান বিক্ষোভ—এই বৈষম্যের ফলে প্লিবিয়ানদের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হইতে থাকে। অনেক সময় এই বিক্ষোভ দেখা দিত অসহযোগ আন্দোলন অথবা বিদ্রোহের আকারে। এই বিক্ষোভ বেশী দিন চলিতে

থাকিলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া শাসক শ্রেণী ধাপে ধাপে প্লিবিয়ানদের অভাব-অভিযোগ দূর করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্লিবিয়ানরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্যাট্রিসিয়ানদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সকল আইন প্রবর্তন করা হয় তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল **দ্বাদশ দফা আইন** বা Twelve Tables। শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানরাও কন্সাল বা রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের পদ লাভের অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

বিত্তবানদের প্রাধান্য—প্লিবিয়ানদের অভাব-অভিযোগ দূর হইলেও রোমের সমাজে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাম্য অথবা সমান অধিকার পুরামাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রোমের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার দিক হইতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল **সেনেট**। সেনেটের সদস্যরা নির্বাচিত হইতেন নাগরিকদের ভোটে। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধনী ব্যক্তিরা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন বেশী। এই অবস্থায় সেনেটের অধিকাংশ সদস্য কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি ছিলেন। মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিকরা তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। সুতরাং নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও রোমের শাসনব্যবস্থা ধনতন্ত্রের নামান্তর ছিল।

দাস-প্রথা—রোমের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান কলঙ্ক ছিল দাস-প্রথার ব্যাপক প্রচলন। দিকে দিকে সামরিক অভিযান চালনা করিয়া রোম ক্রমশঃ নিজের রাজ্যসীমা বাড়াইয়া চলিয়াছিল। বিজিত রাজ্যের বহু অধিবাসী যুদ্ধবন্দী অবস্থায় থাকার পর দাসত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্রীতদাস পিতামাতার সন্তানরাও ক্রমশঃ দাসদের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছিল। জমিজমা চাষ-আবাদের জন্য প্রচুর সংখ্যক দাস নিয়োগ করা হইত। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে গৃহকর্মের জন্যও দাসদের প্রয়োজন হইত। যে সব খনিতে পাথর পাওয়া যাইত সেই সব খনিতে কাজ করার জন্যও বহু দাসদাসী খাটানো হইত। বেতনভুক শ্রমিকদের পরিবর্তে

ক্রীতদাস নিয়োগ বেশী লাভজনক—এই অভিজ্ঞতা হইতে জমি, খনি ও কারখানার মালিকরা ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় দাস নিয়োগে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত বিপুলসংখ্যক দাসদের অসহনীয় কষ্ট এবং অভাব-অভিযোগের মধ্যে দিন কাটাইতে হইত। বয়স্ক দাসদাসীদের কর্মক্ষমতা কমিয়া যাইবে—এই ভয়ে মালিকেরা অনেক সময় তাহাদের প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় করিয়া নূতন দাস ক্রয় করিতেন। যাহারা দেহের শ্রম এবং কর্মকুশলতা দিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় মালিকদের সেবা করিয়া আসিয়াছে তাহাদের প্রতি মালিকদের কোন কর্তব্যবোধ ছিল না। অনায়াসে গরু, ঘোড়া, ভেড়ার মতো ইহাদের ক্রয়-বিক্রয় করা ছিল সে-যুগের সাধারণ ঘটনা। সারি সারি খুপরির মত্যে ছোট ছোট ঘরে, যেখানে সূর্যের আলো অথবা মুক্ত বাতাসের প্রবেশাধিকার ছিল না সেই রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে, অনেক সময় শৃঙ্খলিত অবস্থায় ক্রীতদাসদের দলবদ্ধ হইয়া পশুর মতো জীবন যাপন করিতে দেখা যাইত!

দাস-বিদ্রোহ—এই অবস্থায় নির্যাতিত দাসদের মধ্যে বিক্ষোভ খুব স্বাভাবিক ছিল। এই বিক্ষোভের ফলে তাহারা অনেক সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। এই সব বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল **স্পার্টাকাসের** নেতৃত্বে পরিচালিত এক সশস্ত্র বিদ্রোহ (খ্রীঃ পূঃ ৭৩-৭১)। স্পার্টাকাস ছিলেন মল্লযোদ্ধা। দাসদের অপমান এবং নির্যাতন হইতে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রথমে এই বিদ্রোহে যোগদান করে মাত্র একশত সহচর। ক্রমে ইটালির বিভিন্ন অঞ্চল হইতে একলক্ষ দাস বিদ্রোহী-দলে যোগদান করিলে রোমের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। পর পর তিনবার অভিযান চালনা করিয়াও রোমের বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল। বিজয়ী সশস্ত্র দাস বাহিনী ক্রমে দক্ষিণ ইটালি হইতে অগ্রসর হইল রোম অভিমুখে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজধানী অধিকার করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সেনাপতি ক্রেসাসের নেতৃত্বে পরিচালিত রোমক বাহিনী

বিদ্রোহী সৈন্যদের পরাজিত করিয়া তাহাদের রোম অধিকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দেয়। স্পার্টাকাস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

সাধারণতন্ত্রের অবসান—রোমের সামরিক খ্যাতি ছিল অসাধারণ। এই রাজ্যের সৈন্যদলের শৌর্য-বীর্য ছিল অতুলনীয়। সামরিক শক্তির সাহায্যেই রোমের পক্ষে প্রথমে ইটালির সর্বত্র এবং পরে ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্যবিস্তারের এই নীতি সাধারণতন্ত্রের ভাগ্যে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই ডাকিয়া আনিয়াছিল বেশী মাত্রায়। যুদ্ধ করার জন্য প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন হইত। রোমের নাগরিকরা তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবর্তে বাধ্য হইত দেশ-দেশান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে। ইহার ফলে কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দিত বিপর্যয়। দীর্ঘকাল যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার পর রোমের সাধারণ নাগরিকরা যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেন তখন দেখিতেন যে অনাবাদের ফলে জমির সর্বত্র আগাছার জঙ্গল, উর্বরতার লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই। তাছাড়া কার্থেজ, সিসিলি প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করা হইত প্রচুর খাদ্যশস্য। দেশের উৎপন্ন শস্যের তুলনায় বিদেশ হইতে আমদানি করা শস্যের দাম ছিল সস্তা। ইহার ফলে যাহারা কৃষির উপর নির্ভর করিয়া দিন যাপন করিত তাহারা ক্রমে হইয়া দাঁড়াইল নিঃস্ব এবং দীন দরিদ্র। দেশে বেকারের সংখ্যা বিপজ্জনক মাত্রায় বাড়িয়া চলিল। অন্যদিকে ধনীরা বিলাসী জীবন যাপন করিতেন। ধনবণ্টনের বৈষম্যের কুফল দেখা দিতে বিলম্ব হইল না। তাছাড়া প্রাচীন রোমের নাগরিকদের চরিত্রে একদা যে দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখা যাইত তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। সেনেটে যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তাঁহারা শুধু নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতেন; বৃহত্তর জনসাধারণের অভাব অভিযোগ,
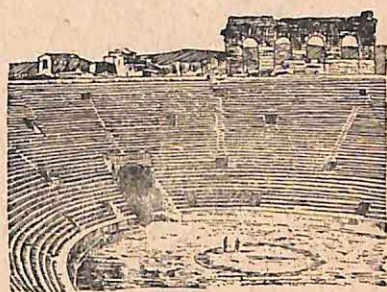
রোমের অ্যাম্ফিথিয়েটার

দুঃখ দুর্দশা দূর করার কোন চেষ্টাই তাঁহারা করিতেন না। বিত্তবানরা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবনযাপন করিতেন, সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রচুর অর্থব্যয় হইত। মানুষ ও পশুদের মধ্যে লড়াই দেখার জন্য বহু প্রেক্ষাগার তৈয়ারী হইত। রাষ্ট্র ও সমাজের উঁচু মহলে দেখা যাইত ব্যাপক দুর্নীতি। সরকারী কর্মচারীরা প্রকাশ্যে ঘুষ লইতেন। যে মুষ্টিমেয় দু'চারজন নেতা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিয়া জনস্বার্থের উপযোগী সংস্কার প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন তাঁহারা হয় ক্ষমতাচ্যুত অথবা নিহত হইতেন। ক্রমে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইল তাহাতে বহু লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল যে, প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা বানচাল করিয়া শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই রোমকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়।

জুলিয়াস সীজার ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—শেষ পর্যন্ত যিনি রোমে একনাযকতন্ত্রের পথ সুগম করেন তাঁহার নাম **জুলিয়াস সীজার** (খ্রীঃ পূঃ ১০২-৪৪)। যৌবনে সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিলেও রাজনীতিতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল বেশী। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি কন্সাল পদে নির্বাচিত হন। এই সময় হইতেই তিনি রোমের শক্তি পুনরুদ্ধার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ক্রেসাস এবং পম্পের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ক্রেসাস ছিলেন রোমের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। রাজনৈতিক মহলে তাঁহার প্রভাব ছিল প্রচুর। পম্পে ছিলেন খ্যাতনামা সমর-নায়ক। ইঁহাদের সহযোগিতা লাভ করিয়া সীজার শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সেনেসেটের পুরাতনপন্থী সদস্যরা ইহাতে বিচলিত বোধ করিলেন। দুই বৎসর পরে

জুলিয়াস সীজার

সীজারকে গল প্রদেশের প্রো-কন্সালের পদে মনোনীত করা হয়। এইখানে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাইলেন। প্রথমেই তিনি সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইয়া বাহিনীর পুনর্গঠন করিলেন। পরে গল প্রদেশের যে অংশ তখনও পর্যন্ত রোমের প্রভুত্ব মানিয়া লয় নাই সেই অঞ্চল জয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের এক অংশের বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি গল প্রদেশের সর্বত্র স্থাপন করিলেন রোমের সর্বময় প্রভুত্ব। ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও তিনি চালনা করিয়াছিলেন দুটি সামরিক অভিযান। রোমের সাধারণতন্ত্রের নায়করা সীজারের এই শক্তিবৃদ্ধি সুনজরে দেখেন নাই। এই সময়ে ক্রেসাসের মৃত্যু ঘটে; পম্পেও সীজারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া সাধারণতন্ত্রের নায়করা সীজারকে অবিলম্বে সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ জারি করিলেন। সীজার বুঝিতে পারিলেন যে, এই অবস্থায় রোমে ফিরিয়া গেলে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের উপর ঘটিবে যবনিকাপাত। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সীজার গভীর আত্মবিশ্বাস লইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন—সেনেটের নির্দেশ তিনি মানিবেন না; এবং তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে রোম অভিমুখে চালনা করিবেন সশস্ত্র অভিযান। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল। সাধারণতন্ত্রী দল সীজারের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিল না। পাঁচ বছর ধরিয়া চলিল গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সীজারের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ও তাঁহাদের সৈন্যবাহিনী সীজারের কাছে পরাজয় মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। গ্রীস, কার্থেজ ও মিশরের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে একের পর এক যুদ্ধে সীজার বিজয়ী হইলেন—রোমের কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন veni, vidi, vici (আমি আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম)। ইহার পর সীজার লাভ করিলেন অপ্রতিহত ক্ষমতা। তিনি গ্রহণ করিলেন Imperator উপাধি। সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদ না করিয়াও তিনি সর্বোচ্চ শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিলেন নিজের হাতে।

রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করিয়াও সীজার স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন নাই। জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য তিনি বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন

করিলেন। রোমের বাহিরের বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের তিনি নাগরিক অধিকার দান করেন। রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দেশের সর্বত্র যাহাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে তাহার উপযোগী ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁহারা গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তাঁহারা সীজারের কার্যকলাপ ভালো চোখে দেখিতে পারেন নাই। সীজার আরও কিছুদিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন থাকিলে রোমে পুরাপুরি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই ছিল তাঁহাদের আশঙ্কা। শুরু হইল সীজারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র। সমাজ-বিরোধী এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক ছিলেন মার্কাস ব্রুটাস। সীজারের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত আনুগত্যের অভাব ছিল না; কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ছিল আরও গভীর। সীজারের অনুগামীরা এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাহাদের নেতাকে হুঁসিয়ারী দিলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। ফলে একদিন সেনেটের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সভাকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র ষড়যন্ত্রকারীরা এক যোগে সীজারকে আক্রমণ করে। সীজার প্রথমে আক্রমণকারীদের বাধা দানের চেষ্টা করেন; কিন্তু যখন তিনি তাহাদের মধ্যে ছুরিকাহাতে প্রিয় অনুচর মার্কাস ব্রুটাসকে দেখিতে পাইলেন তখন আর প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই তিনি করিলেন না। শুধু বলিলেন, "তুমিও ব্রুটাস!" আততায়ীদের ছুরিকায় বিদ্ধ বিগতপ্রাণ সীজারের দেহ লুটাইয়া পড়িল প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পের মূর্তির পাদদেশে (খ্রীঃ পূঃ ৪৪)।

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পতন—সাধারণতন্ত্রীরা ভাবিয়াছিলেন যে সীজারকে নিহত করিয়া তাঁহারা গণতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। এই হত্যাকাণ্ডের ১৭ বৎসর পরেই সীজারের ভাগিনেয় অক্টেভিয়াস-এর নেতৃত্বে রোমে কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হইল সম্রাটের শাসন। 'অগাস্টাস' উপাধি ধারণ করিয়া অক্টেভিয়াস রোমের ইতিহাসে রচনা করিলেন এক নূতন অধ্যায়। অগাস্টাসের পরবর্তী ১১ জন সম্রাটের মধ্যে ৪ জন ছিলেন সীজারের বংশধর।

সম্রাটদের শাসনকালে রোম-সাম্রাজ্যের শক্তি ও আয়তন দুইই বৃদ্ধি

রাখার পর ভ্যাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি উপজাতিদের আক্রমণে রোম-এর ইতিহাস-বিশ্রুত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে (৪৭৬ খ্রীঃ)।

খ্রীষ্টধর্মের প্রসার—রোম সাম্রাজ্যের পতনের এক শতাব্দীরও আগে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন **কনস্ট্যাণ্টাইন** (৩০৬-৩৩৭ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজত্বের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। ধর্ম-সম্পর্কে রোমের শাসকরা উদার ছিলেন। রোমের অধিবাসীরা বহু দেবদেবীর উপাসনা করিত। কালক্রমে মিশর ও ইরাণের দেবতারাও রোমের উপাস্য দেবদেবীগণের মধ্যে স্থান লাভ করেন। একমাত্র ইহুদীদের সম্পর্কেই রোমের শাসকরা কঠোর মনোভাব পোষণ করিতেন। ইহুদীরা রোমের সম্রাটকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করিতে অসম্মত হওয়ায় সম্রাটরা ইহুদীদের সুনজরে দেখিতেন না। ইহুদী এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন বিভেদ তাঁহারা দেখিতেন না। এই কারণে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো হইত। স্বাধীন ভাবে প্রকাশ্যে এই ধর্মমত রোমে প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা রাজধানী হইতে দূরে পাহাড় পর্বতের গুহায় বাস করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু নির্যাতন সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছিল। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন বুঝিতে পারিলেন যে সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি রক্ষা করিতে হইলে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। এই কারণে সম্রাটের এক আদেশ বলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উপর আরোপিত সকল বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করা হইল। ইহার ফলে খ্রীষ্টধর্ম সহজেই পরিণতি লাভ করিল এক বিশ্বধর্মরূপে।

অনুশীলনী

১। কিংবদন্তী অনুসারে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা রোমুলাস। পরপর সাতজন রাজা রোমে রাজত্ব করার পর সপ্তম রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া জনসাধারণ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রোমে প্রতিষ্ঠা করে প্রজাতন্ত্রী শাসন (৫১০ খ্রীঃ পূঃ)।

২। প্রাচীন রোমের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কার্থেজের সহিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলার পর রোম জয়লাভ করিয়া ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে সার্বভৌম প্রাধান্য স্থাপন করে। রোমের ইতিহাস ক্রমিক রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস। কি ভাবে একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা জুড়িয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য—ইহাই রোমের ইতিহাসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

৩। রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরিয়া রোমের সামাজিক জীবনে কোন সমতা ছিল না। প্যাট্রিসিয়ান নামে পরিচিত বিত্তশালী শ্রেণীর লোকেরা, রাষ্ট্রে ও সমাজে ক্ষমতার সিংহভাগ ভোগ করিতেন। দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ প্লিবিয়ানদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ে সঙ্কুচিত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব লইয়া। শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানদের অধিকার অনেক বিষয়ে স্বীকৃতি লাভ করিলেও রোমের শাসনতন্ত্রে, বিশেষতঃ সেনেটের গঠনে, বিত্তবান লোকেরাই প্রাধান্য ভোগ করিত।

৪। রোমের সমাজ-জীবনের একটি কলঙ্ক ছিল দাস-প্রথার ব্যাপক প্রচলন। দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাদের শ্রমের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে রোমের অর্থনৈতিক জীবন, অথচ ইহারা নানাভাবে অত্যাচারিত হইত। ইহার ফলে দাসদের মনে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। এই বিক্ষোভের প্রবল প্রকাশ স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহ।

৫। প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা রোমের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। ইহার ফলে দেশে বেকারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়। সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বাড়িয়া চলে অসন্তোষ। এই অবস্থায় রোমে সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়া উঠে।

৬। একনায়তন্ত্রের পথে রোমের অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ জুলিয়াস সীজার কর্তৃক ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা। প্রথমে পম্পে ও ক্রেসাস-এর সহযোগিতায় এবং পরে নিজের চেষ্টায় সামরিক বাহিনীর সাহায্যে সীজার প্রচলিত শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করেন।

৭। সীজারের এই ক্ষমতালাভ গণতন্ত্রীদের পছন্দ হয় নাই। গণতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তাঁহারা সীজারের প্রাণনাশ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রোমে প্রজাতন্ত্রী শাসনের অবসানে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাটদের শাসন। প্রায় চারশো বৎসর ধরিয়া সম্রাটদের শাসন অব্যাহত

ছিল। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের শাসনকালে খ্রীষ্টধর্মের উপর হইতে সকল বাধা নিষেধ অপসৃত হওয়ার ফলে উহা দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে। পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে বিভিন্ন উপজাতির আক্রমণের ফলে রোমের পতন এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

প্রশ্নমালা

১। উত্তর দাও :—

(ক) রোম নগরের প্রতিষ্ঠাতা কে? (খ) রোমে প্রথমে কি ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল? কবে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রবর্তিত হয়? ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে রোমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল?

২। কার্থেজ কোথায় অবস্থিত ছিল? রোমের সহিত যুদ্ধে কার্থেজের দুজন প্রধান সেনানায়কের নাম লেখ।

৩। প্যাট্রিসিয়ান বলিতে কি বোঝ? ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কাহারা অপছন্দ করিত?

৪। এগুলি সম্পর্কে কি জান? দ্বাদশ দফা আইন, প্লিবিয়ান, কন্সাল, সেনেট।

৫। শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর: (ক) প্রাচীন ইউরোপে সামরিক শক্তিতে, সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে—ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। (খ) কার্থেজ নগরটি অবস্থিত ছিল—উত্তর অঞ্চলে। (গ)—দ্বীপের আধিপত্য হইয়া রোম ও—মধ্যে শুরু হয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (ঘ) — ছিলেন প্রাচীনযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর-নায়ক। (ঙ) নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও রোমের শাসন ব্যবস্থা — নামান্তর ছিল। (চ) রোমের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের প্রধান কলঙ্ক ছিল—ব্যাপক প্রচলন।

৬। স্পার্টাকাস কে ছিলেন? তাঁহার কথা আমরা এখনও স্মরণ করি কেন?

৭। রোমের প্রজাতন্ত্রী শাসন কি কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল?

৮। জুলিয়াস সীজারের জীবনী সংক্ষেপে লেখ।

৯। জনসাধারণের এবং দেশের উন্নতির জন্য সীজার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১০। কনস্ট্যাণ্টাইনের রাজত্বকাল কি কারণে প্রসিদ্ধ?

৮ চীন
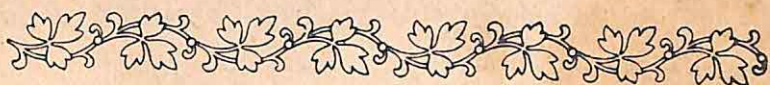
মহান সাঙ্ বংশ—আদিম যুগে চীন কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পরে চীনের প্রায় সর্বত্র জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্রী শাসন। প্রাচীন চীনে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। চীনের প্রাচীন পুঁথিপত্রে প্রাচীনতম রাজবংশ হিসাবে সাঙ্ বংশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ যুগের অধিবাসীরা লিখিতে ও পড়িতে জানিত, ব্রোঞ্জের পাত্রের গায়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারিত সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকার্য। কৃষি ও পশুপালন ছিল ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। পশমের ব্যবহারও ইহাদের জানা ছিল। এই যুগের বহু রাজপ্রাসাদ, দুর্গ এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাঙ্ রাজাদের রাজধানী ছিল পীত নদীর উত্তর-মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত আনিয়াঙ নগরে। এই রাজবংশ পাঁচশত বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ১৫২৩-১০২৭ অব্দ) রাজত্ব করেন। পরে শুরু হয় **চৌ** রাজবংশের শাসন। এই রাজবংশের শেষে স্থাপিত হয় **চিন** বা **সিন** বংশের প্রাধান্য। এই বংশের সব চাইতে বিখ্যাত শাসক **সি হোয়াঙ তি**। ইনিই চীনের প্রথম সম্রাট (খ্রীঃ পূঃ ২২১ অব্দ)।

চীনের একটি পাত্র

যে সময়ে প্রায় সমগ্র চীনদেশ জুড়িয়া সি হোয়াঙ তি-র নেতৃত্বে স্থাপিত হয় প্রথম সাম্রাজ্য, তাহার বহু আগে চীন দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এক

পরম জ্ঞানী পুরুষ। ইনি স্বনামধন্য **কনফুসিয়াস** (খ্রীঃ পূঃ ৫৫১-৪৭৮ অব্দ)। বর্তমান সাংটুঙ্-এর অন্তর্ভুক্ত লু প্রদেশের একটি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র তিন বৎসর বয়সে ইনি পিতৃহারা হইয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি স্থায়ীভাবে সাংটুঙ্-এ বসবাস শুরু করেন। এই সময় তিনি নিযুক্ত হন লু'র শাসনকর্তার পদে। কিন্তু সরকারী কাজ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যেই পদত্যাগ করিয়া তিনি চীনের নানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ শুরু করেন। পরে তিনি লু'তে ফিরিয়া আসেন এবং এখানেই শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

কনফুসিয়াস ও তাঁহার শিক্ষাদর্শ—কনফুসিয়াস ছিলেন প্রাচীন যুগের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। তিনি কোন ধর্মমত প্রচলন করেন নাই। জনসাধারণের মধ্যে তিনি প্রচার করিতেন ন্যায়নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আদর্শ। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কাব্যে বিভিন্ন সময় যে সব আদর্শের কথা বলা হইয়াছে, প্রবীণ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের যে সব বাণী ও চিন্তাধারার আলোচনা রহিয়াছে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া কনফুসিয়াস জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেন। মানুষকে তিনি শিক্ষা দিতেন সৎ, সরল জীবন যাপন করিতে, ন্যায়-নীতির আদর্শকে মানিয়া চলিতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে। ছোট ছোট উপাখ্যানের মাধ্যমে তিনি সকলের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় তুলিয়া ধরিতেন তাঁহার শিক্ষার মূল বিষয়। একবার কনফুসিয়াস দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন—এক জায়গায় নির্জন স্থানে তিনি দেখিতে পাইলেন যে একটি সমাধি স্থানের কাছে দাঁড়াইয়া একটি স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে। শোকের

কনফুসিয়াস

কারণ জানিতে চাহিলে স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে জানাইল যে তাহার শ্বশুর এবং স্বামী পরপর বাঘের হাতে প্রাণ দিয়াছে। একমাত্র অবলম্বন ছিল তাহার পুত্র। কিন্তু সম্প্রতি সেই পুত্রটিও একই ভাবে মারা গিয়াছে। কনফুসিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন—যে রাজ্যে এতো বাঘের ভয়, সেখানে বাস করিতেছ কেন? স্ত্রীলোকটি উত্তরে জানাইল যে, এখানকার শাসকরা অত্যাচারী নন। গল্পটি উল্লেখ করিয়া দার্শনিক শ্রোতাদের বলিতেন—দেখ, বাঘের চাইতেও ভয়ের বস্তু অত্যাচারী সরকার।

চীনের প্রাচীর—চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল সম্রাট সি হোয়াঙ তি-র রাজত্বকালে। ২০ হইতে ৩০ ফুট উঁচু, ১৫ হইতে ২৫ ফুট চওড়া এই প্রাচীরটি নির্মাণ করিতে সময় লাগিয়াছিল ১০ বৎসর। যাযাবর
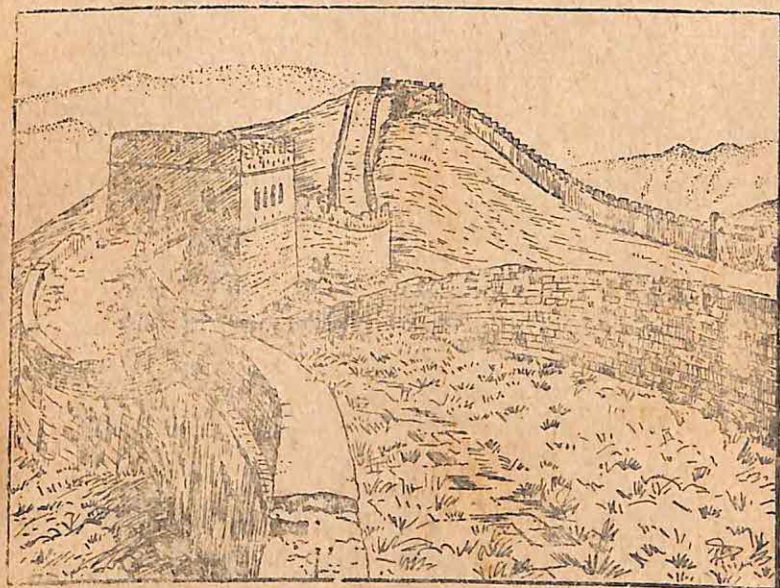
চীনের প্রাচীর

জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইহা নির্মিত হইয়াছিল। বহু শ্রমিককে জোর করিয়া বিনা মজুরিতে এই প্রাচীর তৈয়ারীর কাজে নিয়োগ

করা হইয়াছিল। এই কারণে চীনের অধিবাসীদের অনেকেই এই প্রাচীরটি সুনজরে দেখেন নাই। পরে এই প্রাচীরটির স্থানে স্থানে পাথর বসাইয়া ইহাকে দৃঢ়তর করা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রাচীরটি দৈর্ঘ্যে দাঁড়ায় ১৪০০ মাইল।

সিন্ সাম্রাজ্য—সিন্ বংশের রাজত্বকালে চীনদেশে একদিকে যেমন গড়িয়া উঠিয়াছিল রাজনৈতিক ঐক্য, অপর দিকে তেমনই সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘটিয়াছিল প্রভূত উন্নতি। এই বংশের প্রথম সম্রাট সি হোয়াঙ তি শুধু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারই প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সাম্রাজ্যের খনিজ সম্পদ বাড়াইয়া তিনি অর্থনৈতিক জীবনেও ঘটাইয়াছিলেন অভাবনীয় উন্নতি। ব্যবসায় বাণিজ্যের যাহাতে প্রসার ঘটে সেদিকেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। চীনদেশের পুঁথিপত্রের সাক্ষ্য অনুসারে এই সময়ে চীন দেশের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

সম্রাট সি হোয়াং তি একটি খামখেয়ালের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল ইতিপূর্বে চীন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যাঁহারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কেহই কোন মহৎ সৃষ্টির পরিচয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কারণে তিনি পুরানো ইতিহাস বই পুড়াইয়া ফেলার নির্দেশ দিলেন। ইহার ফলে অনেক পুঁথিপত্র চিরকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। সান্ত্বনার কথা এই যে, দেশের পণ্ডিত লোকেরা অনেকেই অনেক ভাল ভাল পুঁথিপত্র আগে হইতেই নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাছাড়া চিকিৎসা বিদ্যা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই-এর ধ্বংস সরকারী আদেশের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছিল।

সি হোয়াং তি-র মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই এই রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া চীন দেশে কৃষক পরিবারের সন্তান লিউ পাঙ-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় **হান** বংশের শাসন (খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দ)।

অনুশীলন

১। চীনের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন প্রসিদ্ধ দার্শনিক **কনফুসিয়াস**। তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সরল, অনাড়ম্বর ভাবে জীবন যাপন করিতে।

২। চীনের বিশাল প্রাচীর প্রাচীন চীনের এক অক্ষয় কীর্তি। সাঙ্ ও চীন রাজবংশের রাজত্বকালে চীন দেশে একদিকে রাজনৈতিক সংহতি এবং অপরদিকে সাংস্কৃতিক প্রগতি বৃদ্ধি পায়।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তিনি কি আদর্শ প্রচার করিতেন?

২। চীনের প্রাচীর কে নির্মাণ করেন? এই প্রাচীরটির কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। চীনের অনেকেই এই প্রাচীরটিকে কেন সুনজরে দেখে নাই?

৩। চীনের বিভিন্ন রাজবংশের নাম লেখা হইল। সময় সীমা অনুসারে ইহাদের পর পর সাজাও।

চিন বংশ, চৌ বংশ, হান বংশ ও সাঙ্ বংশ।

৪। সি হোয়াঙ তি কে ছিলেন? তাঁহার খামখেয়ালীপনার একটি উদাহরণ দাও।

৫। উত্তর দাও:

(ক) চীনের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজবংশের নাম কী?

(খ) চীনের প্রথম সম্রাট কে?

(গ) কনফুসিয়াস গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন। এ ধরণের একটি গল্প তোমার নিজের কথায় লেখ।

১ ভারতবর্ষের পরিচয়

আর্য জাতির আগমন—আমরা দেখিয়াছি যে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল সিন্ধু উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এর পরের যুগে আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আর একটি রূপ। এই সভ্যতার মূলে ছিল আর্যদের অবদান। আর্য কোন একটি জাতির নাম নয় ; আর্যভাষায় যাঁহারা কথাবার্তা বলিতেন তাঁহাদেরই বলা হইত আর্য।

আজ হইতে অন্ততঃ তিন, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যদের আমরা ভারতে দেখিতে পাই। ইহার আগে তাঁহারা ভারতবর্ষে ছিলেন অথবা বাহিরের অন্য কোন দেশ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। ভারতের বাহির হইতে আসিলে কোন দেশ তাঁহাদের আদিম বাসভূমি ছিল তাহাও আমরা পুরাপুরি জানিতে পারি না।

বৈদিক সাহিত্য—আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। 'বেদ' কথাটির অর্থ জ্ঞান। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ কোন মানুষের রচনা নয়। ঋষিদের কাছে উচ্চারিত দৈববাণী লইয়া ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বেদের সংখ্যা চার—**ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব**। ঋক বেদে রহিয়াছে প্রকৃতির উদ্দেশে রচিত স্তবস্তুতি। সামবেদ অনেকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। যাগযজ্ঞের সময় এই সব মন্ত্র গাওয়া হইত। যাগযজ্ঞের সময় যে সকল মন্ত্রের উচ্চারণ বিধেয় ছিল সেই সকল মন্ত্র লইয়া রচিত হইয়াছে যজুর্বেদ। অথর্ববেদে আছে সৃষ্টিরহস্য, চিকিৎসার মন্ত্র ইত্যাদি। প্রতিটি বেদের চারটি ভাগ—**সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ**। সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় দেবদেবীদের উদ্দেশে রচিত মন্ত্র। যাগযজ্ঞ

সম্পর্কে নিয়ম কানুন লইয়া রচিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ ভাগ। সংসার হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা বেশী বয়সে তপোবনে বসবাস করিবেন তাঁহাদের উদ্দেশে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে আরণ্যকে। বেদের শেষ ভাগের নাম **উপনিষদ** অথবা **বেদান্ত**। ইহার মধ্যে রহিয়াছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয়।

বৈদিক যুগে আর্য সমাজ—বেদ ধর্মগ্রন্থ ; তবুও ইহার মধ্যে ছড়ানো রহিয়াছে ধর্ম ছাড়া প্রাচীন যুগের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে নানা কথা।

আর্যরা প্রথমে বাস করিতেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। পরে তাঁহারা বসতি স্থাপন করেন পাঞ্জাবে। সেখান হইতে তাঁহারা ছড়াইয়া পড়েন উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভারতের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁহাদের সদ্ভাব ছিল না। দুই পক্ষে বহু কাল ধরিয়া সংঘর্ষ চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত আর্যরা জয়ী হন। গোটা উত্তর ভারত তাঁহাদের নাম অনুসারে পরিচিত হয় **'আর্যাবর্ত'** নামে।

বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে আর্যদের সমাজে জাতিভেদের প্রচলন ছিল না। আর্যরা ছিলেন শ্বেতবর্ণ। বৈদিক সাহিত্যে যাঁহাদের অনার্য বলা হইয়াছে তাঁহারা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ। সমাজে ইহারা ছিলেন দুটি আলাদা সম্প্রদায়। পরে আর্যদের মধ্যে গড়িয়া উঠে চারিটি **বর্ণ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন। ক্ষত্রিয়দের উপর ছিল রাজ্যশাসন ও দেশরক্ষার দায়িত্ব। বৈশ্যদের বৃত্তি ছিল কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায় বাণিজ্য। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন শূদ্ররা। উচ্চতর তিনটি বর্ণের সেবা করাই ছিল তাঁহাদের কর্তব্য। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে প্রথম তিনটি বর্ণের মধ্যে বিবাহে কোন বাধা ছিল না। এই তিন বর্ণের লোকেরা স্ব-ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিতেন।

বৈদিক যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য—**আশ্রম** বিভাগ। এই যুগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জীবনে ছিল **চারটি ভাগ** বা **আশ্রম**—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, **বানপ্রস্থ** ও **সন্ন্যাস**। প্রথম আশ্রমটিকে বলা হইত **ব্রহ্মচর্য**। এই সময়

আর্য বালককে গুরুগৃহে থাকিয়া পড়াশোনা করিতে হইত। দ্বিতীয় আশ্রম **গার্হস্থ্য**। এই সময়ে গৃহে ফিরিয়া সংসার ধর্ম পালনের বিধান ছিল। তৃতীয় আশ্রমের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে পরিণত বয়সে সংসার হইতে দূরে নির্জন জায়গায় অথবা তপোবনে বসবাস করা ছিল বাধ্যতা-মূলক। চতুর্থ এবং শেষ আশ্রমকে বলা হইত সন্ন্যাস। এই সময়ে সংসারের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঈশ্বর উপাসনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করার নির্দেশ ছিল।

বৈদিক যুগে নারীরা ছিলেন বিশেষ সম্মানের পাত্রী। প্রথম তিন বর্ণের বালিকারা শিক্ষার সব রকম সুযোগ পাইতেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক নারী তাঁহাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—**ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, গার্গী ও মৈত্রেয়ী**। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বেদের বহু মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সে-যুগে বাল্য-বিবাহের প্রচলন ছিল না। বিধবাদের পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহের পথে কোন বাধা ছিল না। স্বামীর সহধর্মিণী হিসাবে মহিলারা যাগযজ্ঞ ও দানধ্যানে অংশ গ্রহণ করিতেন।

খাদ্য ও পরিচ্ছদ—বেদের যুগে আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল যব বা গমের রুটি, ভাত, শাক-সবজি, পশুপক্ষীর মাংস, ফলমূল। তাঁহাদের প্রধান পানীয় ছিল দুধ। তাঁহারা পরিধান করিতেন কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র ও পোষাক। খেলাধূলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রথচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, শিকার, অভিনয় ও নৃত্যগীত। তাঁহাদের মধ্যে জুয়াখেলারও প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃত্তি—বৈদিক সাহিত্যে যে যুগের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার প্রথম ভাগে বেশীর ভাগ লোকজন বাস করিত গ্রামে। বাড়ীঘর ছাড়া গ্রামে ছিল কৃষির জমি এবং পশুচারণের ক্ষেত্র। সে যুগের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি এবং পশুপালন। জমিকে উর্বর করিয়া তোলার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে প্রধান ছিল গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া ও কুকুর। কৃষি ও পশুপালন ছাড়া ক্রমে আরও কয়েকটি বৃত্তির উদ্ভব ঘটে—এগুলি

গড়িয়া উঠে বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া। ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত শিল্প গড়িয়া উঠে। শিল্পী হিসাবে যাঁহারা জীবিকা অর্জন করিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন চর্মকার, কর্মকার, ধাতুশিল্পী, অলঙ্কার প্রস্তুতকারক, তাঁতী ও ছুতার। বৈদিক যুগে ব্যবসায় বাণিজ্যও ছিল জীবনধারণের আর একটি উপায়। এই যুগের বণিকরা স্থল ও জল উভয় পথেই ব্যবসায় বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিলেন। জলপথে তাঁহারা জাহাজ বোঝাই নানাবিধ পণ্য বিদেশে চালান দিতেন। প্রথমে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং পণ্যের আদান-প্রদান চলিত বিনিময় প্রথার সাহায্যে। শস্যের বদলে বস্ত্র, বস্ত্রের বদলে অলঙ্কার—এই ভাবে চলিত আদান প্রদান। পরে মুদ্রার প্রচলন হয়। বৈদিক যুগের মুদ্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নিষ্ক, শতমান এবং সুবর্ণ। এই যুগের শেষ ভাগে নগরের পত্তন ঘটিতে শুরু করে।

ধর্ম—বৈদিক যুগের আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবদেবী মনে করিয়া উপাসনা করিতেন। দেবতাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গের দেবতা দ্যৌঃ, বৃষ্টির দেবতা বরুণ, বায়ুর দেবতা মরুৎ ; সূর্য, উষা, অগ্নিও ছিলেন আর্যদের উপাস্য। সে-যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। প্রথম যুগে উপাসনার রীতিনীতি ছিল সরল। পরবর্তী যুগে এগুলি জটিল হইয়া দাঁড়ায় এবং ধর্ম ও সমাজ জীবনে পুরোহিত শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে।

রাজনৈতিক অবস্থা—বৈদিক সাহিত্যে সে-যুগের রাজনৈতিক অবস্থার কথাও কিছু কিছু জানা যায়। অন্যান্য প্রাচীন জাতির মতো ভারতীয় আর্যরাও বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া বসবাস করিতেন। এই সকল দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অভাব ছিল না। পরে তাঁহারা নিজেদের স্বার্থে বৃহত্তর গোষ্ঠী গঠনের প্রয়োজন বোধ করেন। ইহার ফলে কয়েকটি গ্রাম লইয়া গড়িয়া উঠে **বিশ্** বা **জন**। যিনি বিশ্ বা জনের নেতৃত্ব করিতেন তাঁহাকে বলা হইত **বিশ্-পতি** অথবা **রাজা**। সর্বোচ্চ পদমর্যাদা সত্ত্বেও ইনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। গ্রামণী, সেনানী এবং পুরোহিত—এই তিন শ্রেণীর ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পরামর্শ লইয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। এছাড়া ছিল সভা ও সমিতি নামে পরিচিত তু'টি সংস্থা। সভায় মিলিত হইতেন গণ্যমান্য

ব্যক্তিরা আর সমিতিতে যোগদান করিতেন জনপ্রতিনিধিরা। শাসনকার্যে রাজাকে উপদেশ দেওয়া ছিল তাঁহাদের কাজ।

প্রথমে রাজারা বংশানুক্রমে রাজ্যশাসন করিতেন। পরে প্রজারা রাজা নির্বাচনের অধিকার পায়। নির্বাচনের পর রাজা **শপথ** গ্রহণ করিতেন যে প্রজাদের মঙ্গল সাধন এবং অধিকার রক্ষাই হইবে তাঁহার প্রধান কর্তব্য। অবশ্য পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজপদ আবার বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়ায়। রাজাদের মধ্যে যিনি সব চাইতে ক্ষমতাশালী এবং যিনি অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিতে পারিতেন তিনি গ্রহণ করিতেন **'একরাট', 'সম্রাট'**, বা **'রাজচক্রবর্তী'** উপাধি। ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে যুগের রাজারা নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সকল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান ছিল দু'টি—**অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ**।

মহাকাব্য—বৈদিক সাহিত্যের আয়তন বিশাল। বহু বৎসর ধরিয়া এই সাহিত্যের রচনা চলিয়াছিল। এই কারণে প্রথম দিকের বৈদিক সাহিত্য এবং পরবর্তী কালের সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় দীর্ঘ কালের ব্যবধান। বৈদিক যুগের শেষভাগে যে যুগের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল **মহাভারত ও রামায়ণ**। এ দু'টি মহাকাব্য ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় সাহিত্য। কিংবদন্তী অনুসারে এ দু'টি মহাকাব্যের রচয়িতা যথাক্রমে ব্যাসদেব এবং বাল্মীকি। কিন্তু যে রূপে রামায়ণ ও মহাভারত বর্তমানে আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কোন একটি সুনির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে অথবা কোন দুই বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা এই দু'টি অমর কাব্য রচিত হয় নাই। বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির উদ্যোগে দীর্ঘকাল ধরিয়া এগুলি রচনার কাজ চলিয়াছিল।

রামায়ণের প্রধান পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতা লইয়া রচিত হইয়াছে এই মহাকাব্য। বর্ণিত কাহিনী উপন্যাসের মতো চমকপ্রদ। ইহাতে রহিয়াছে আদর্শচরিত্র বহু নরনারীর জীবনের কাহিনী। সকল বয়সের সকল শ্রেণীর মানুষ এই গ্রন্থখানি পড়িয়া লাভ করে পরম আনন্দ।

মহাভারতের মূল বিষয় গড়িয়া উঠিয়াছে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ লইয়া। ১৮টি পর্বে লেখা বিশাল এই গ্রন্থে রহিয়াছে বহু বীর পুরুষ এবং বীরাঙ্গনাদের কাহিনী। রামায়ণের মতো মহাভারতও একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ।

যাঁহাদের কীর্তিকলাপের কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এদু'টি মহাকাব্যের বিপুল আয়তন তাঁহারা অনেক যুগ আগের নরনারী। কিন্তু তাঁহাদের দূরের মানুষ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের জীবনযাত্রা, চাল-চলন, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, আহারবিহার, দেবদেবীর প্রভৃতির যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে আমরা সে যুগের ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিতে পারি। তাছাড়া এ দু'টি গ্রন্থে যে সব মহাপুরুষ এবং মহীয়সী মহিলার বিবরণ আমরা পাই তাঁহারা আজও আমাদের কাছে বাঁচিয়া রহিয়াছেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র রূপে। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভরতলক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার পতিভক্তি, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, অর্জুনের বীরত্ব, শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান, কর্ণের বদান্যতা আজও আমাদের মনে জাগায় সশ্রদ্ধ প্রেরণা।

ধর্মবিপ্লব—সিন্ধু সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার যুগে ভারতবাসীদের চিন্তাধারা, ধর্মজীবন কি ধরনের ছিল আমরা দেখিয়াছি। তখনকার যুগের ধর্ম সংক্রান্ত রীতিনীতি ছিল সরল এবং অনাড়ম্বর। বৈদিক যুগের শেষ ভাগ হইতে এই অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ক্রমে উপাসনা পদ্ধতিতে দেখা দেয় নানা ধরনের জটিলতা। পুরোহিত শ্রেণী এবং ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জাতিভেদও কঠোর হইয়া উঠে। এই অবস্থায় যখন সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের মনে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমিতে থাকে সে সময় আবির্ভূত হন দুই জগদ্বিখ্যাত ধর্মগুরু—মহাবীর ও বুদ্ধ। ইহাদের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ, জন্মস্থান পূর্ব ভারত।

জৈনধর্মের উৎপত্তি ও শিক্ষা—উত্তর বিহারের বৈশালী নগরের কাছে অবস্থিত কুন্দগ্রাম। এখানে জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান। পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতা ত্রিশলা। পিতা 'জ্ঞাতৃক' নামে পরিচিত ক্ষত্রিয়কুলের নায়ক, মাতা লিচ্ছবি রাষ্ট্রের নায়কের ভগ্নী।

ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও বর্ধমান যখন যুবক তখন দেখা

গেল ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁহার কোন মোহ নাই। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সংসার-জীবন যাপনের পর বর্ধমান সংসারের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া গ্রহণ করিলেন পরিব্রাজকের জীবন। মানুষের সেবা তাঁহার লক্ষ্য, মানবজাতির কল্যাণসাধন ব্রত। একটানা বার বৎসর নানা জায়গায় ঘুরিয়া, নানাভাবে তপশ্চারণের পর তিনি লাভ করিলেন আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি। সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করায় তিনি পরিচিত হইলেন নিগ্রন্থ নামে। রিপুজয়ী এই মহাপুরুষের আর একটি পরিচয় হইল জিন (জয়ী) বা **মহাবীর** নামে।

মহাবীর বর্ধমান

মহাবীর যে ধর্মমত প্রচার করেন তাহা জৈনধর্ম নামে পরিচিত। তিনি বলিতেন, কাহাকেও হিংসা করিবে না ; পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না ; মিথ্যা কথা বলিবে না এবং সংসারের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া সকল অবস্থায় ব্রহ্মচর্যের আদর্শ পালন করিয়া চলিবে।

মহাবীর যাগযজ্ঞের প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না। বেদকেও তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি এবং তাঁহার অনুগামীরা অহিংসা-নীতি পালনের উপর আরোপ করিতেন সর্বাধিক গুরুত্ব। তাঁহারা মনে করিতেন যে, জড়বস্তুর মধ্যেও প্রাণ আছে। চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে তাঁহারা হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও উপদেশ—বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক **গৌতম বুদ্ধ**। মহাবীরের মতো ইনিও ছিলেন পূর্বভারতের এক ক্ষত্রিয় সন্তান। তাঁহার জন্মস্থান শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তু নগর। শাক্যনায়ক শুদ্ধোদন তাঁহার পিতা, মাতার নাম মায়াদেবী। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েকদিন

পরেই মায়াদেবী পরলোক গমন করেন। বিমাতা মহাপ্রজাপতি শিশুটিকে নিজের সন্তানের মতো পালন করেন। বালকের নাম রাখা হয় গৌতম বা সিদ্ধার্থ। তখনকার যুগে ক্ষত্রিয় বালকদের যেভাবে শিক্ষাদান করা হইত গৌতমকেও সেইভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইয়াছিল। কিন্তু তবু কিশোর অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও গৌতম নিজেকে সুখী বোধ করিতে পারেন নাই। বিবাহের পর এবং পুত্রসন্তান লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন হয় নাই। মানুষের দুঃখকষ্ট, রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু দেখিয়া তিনি কাতর হইতেন। কিভাবে এই দুঃখকষ্ট দূর করিয়া মানুষের মনে চিরন্তন আনন্দ জাগ্রত করা যায়—ইহাই ছিল গৌতমের একমাত্র চিন্তা। একদিন গভীর রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইলেন সত্যের সন্ধানে। জ্ঞান অনুশীলন এবং তপশ্চর্যার মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার পর তিনি সংকল্প গ্রহণ করিলেন—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। অবশেষে তিনি লাভ করিলেন **সম্যক্ জ্ঞান** অথবা **সম্বোধি**। গয়ার নিকটে অবস্থিত উরুবিল্ব নামক গ্রামে এক বোধিদ্রুমের নীচে ঘটিয়াছিল গৌতমের সম্বোধি লাভ। এই স্থানটি বুদ্ধভক্তদের কাছে গৌতমের জন্মভূমি লুম্বিনী গ্রামের মতোই পরম পবিত্র তীর্থস্থান। সিদ্ধিলাভের পর গৌতম পরিচিত হইলেন বুদ্ধ অথবা পরমজ্ঞানী **তথাগত** রূপে।

বুদ্ধ তথাগত

বুদ্ধ তাঁহার ধর্মমত সর্বপ্রথম প্রচারিত করেন বারাণসীর উপকণ্ঠে অবস্থিত সারনাথের মৃগদাবে। এই ঘটনাটি ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে পরিচিত। দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া উত্তর ভারতের নানাস্থানে অনবরত ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রচার

করিয়াছিলেন তাঁহার ধর্মমত। মহাবীরের উপদেশের মতো বুদ্ধের বাণীও ছিল সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য ভাষায় তিনি উপদেশ দিতেন এবং সহজেই তাহা মানুষের অন্তর স্পর্শ করিত। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশে যে বাণী তিনি প্রচার করিতেন তাহার মূল বক্তব্য—প্রাণীমাত্রই দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে; এই দুঃখের মূলে রহিয়াছে মানুষের বাসনা-কামনা; বাসনা-কামনা জয় করিতে পারিলেই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইবে। এই মুক্তিলাভই নির্বাণ। এই নির্বাণ লাভের জন্য তিনি সকলকে পঞ্চশীল অনুশীলনের উপদেশ দিতেন। অহিংসা, অচৌর্য, সংযম, সত্যভাষণ এবং বৈরাগ্য—এই পাঁচটি বৃত্তি আয়ত্ত করিতে পারিলেই দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব।

মহাবীর-প্রচারিত ধর্ম ভারতের বাহিরে প্রচারিত না হইলেও বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম অপেক্ষা বেশী স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাহিরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গৃহীত হইলেও ভারতবর্ষে ইহার ব্যাপকতা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

মগধ সাম্রাজ্যের উত্থান—সিন্ধু সভ্যতার যুগ হইতে শুরু করিয়া মহাবীর বুদ্ধের যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সভ্যতার ও সমাজ-জীবনের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এবার আমরা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিক-ভাবে আলোচনা করিব। বেদের যুগ কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে আমরা রাজনৈতিক জীবনের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহার মধ্যে ধারাবাহিকতা নাই। ধারাবাহিক ইতিহাস শুরু হইয়াছে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক হইতে মগধকে কেন্দ্র করিয়া। মগধ রাজ্যটি অবস্থিত ছিল দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে। বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক কালে যিনি মগধ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তিনি **বিম্বিসার**। ইনি হর্যঙ্ক বংশের সন্তান। তাঁহার রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। বিহারের পূর্বভাগে অবস্থিত অঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া তিনি উহা অধিকার করিয়া লন। রাজ্যের আয়তন কিংবা নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য তিনি কেবল সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেন নাই। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি কোশল, বিদেহ ও মদ্র—এই তিনটি রাজ্যের সহিত

সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার রাজার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

বিম্বিসারের পর মগধের রাজা হইলেন **অজাতশত্রু**। তাঁহার রাজত্বকালে কাশী ও বৈশালী রাজ্য দুইটি মগধ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অজাতশত্রুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র **উদয়ী**। তিনি গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্রে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুরক্ষিত এই নগরটি ছিল ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র।

বিম্বিসারের বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়া মগধে এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন **শিশুনাগ**। অবন্তীর রাজাকে পরাজিত করিয়া বারাণসী পর্যন্ত তিনি মগধের সীমানা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শিশুনাগের পর তাঁহার কয়েকজন বংশধর পর পর রাজত্ব করেন। তারপর মগধে প্রতিষ্ঠিত হয় নন্দবংশের শাসন।

নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা **মহাপদ্ম নন্দ**। ইনি ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। ইহার আগে ভারতের আর কোন নরপতি এইরূপ বিশাল আয়তনের রাজ্য শাসন করেন নাই।

মহাপদ্মের পর তাঁহার আট পুত্র পর পর রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা ধন নন্দ। ইনি প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিতেন। অত্যাচারী এবং জনসাধারণের বিরাগভাজন এই রাজাকে পরাজিত করিয়া মগধে মৌর্যবংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন **চন্দ্রগুপ্ত**। চন্দ্রগুপ্তে সহায় ছিলেন তক্ষশিলাবাসী এক ব্রাহ্মণ; তাঁহার নাম চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। কূটনীতিতে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াই তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সকল অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্ত সেই সকল অঞ্চল হইতে গ্রীক বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সিরিয়ার গ্রীক রাজা

অশোকের সাম্রাজ্য
সাম্রাজ্যের সীমা
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
কাশ্মীর
গন্ধার
তক্ষশিলা
হিমালয়
পর্বত শ্রেণী
তিব্বত
তোপরা
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
মথুরা
কপিলাবস্তু
কুশীনগর
বৈশালী
কামরূপ
বৈরাট
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র নদ
কাশী
চম্পা
উজ্জয়িনী
সুরাষ্ট্র
তাম্রলিপ্তি
গিরনার
প্রতিষ্ঠান
গোদাবরী নদী
কৃষ্ণা নদী
মাসকি
পেন্নার নদী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
চোল
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী (লঙ্কা)
ভারত মহাসাগর
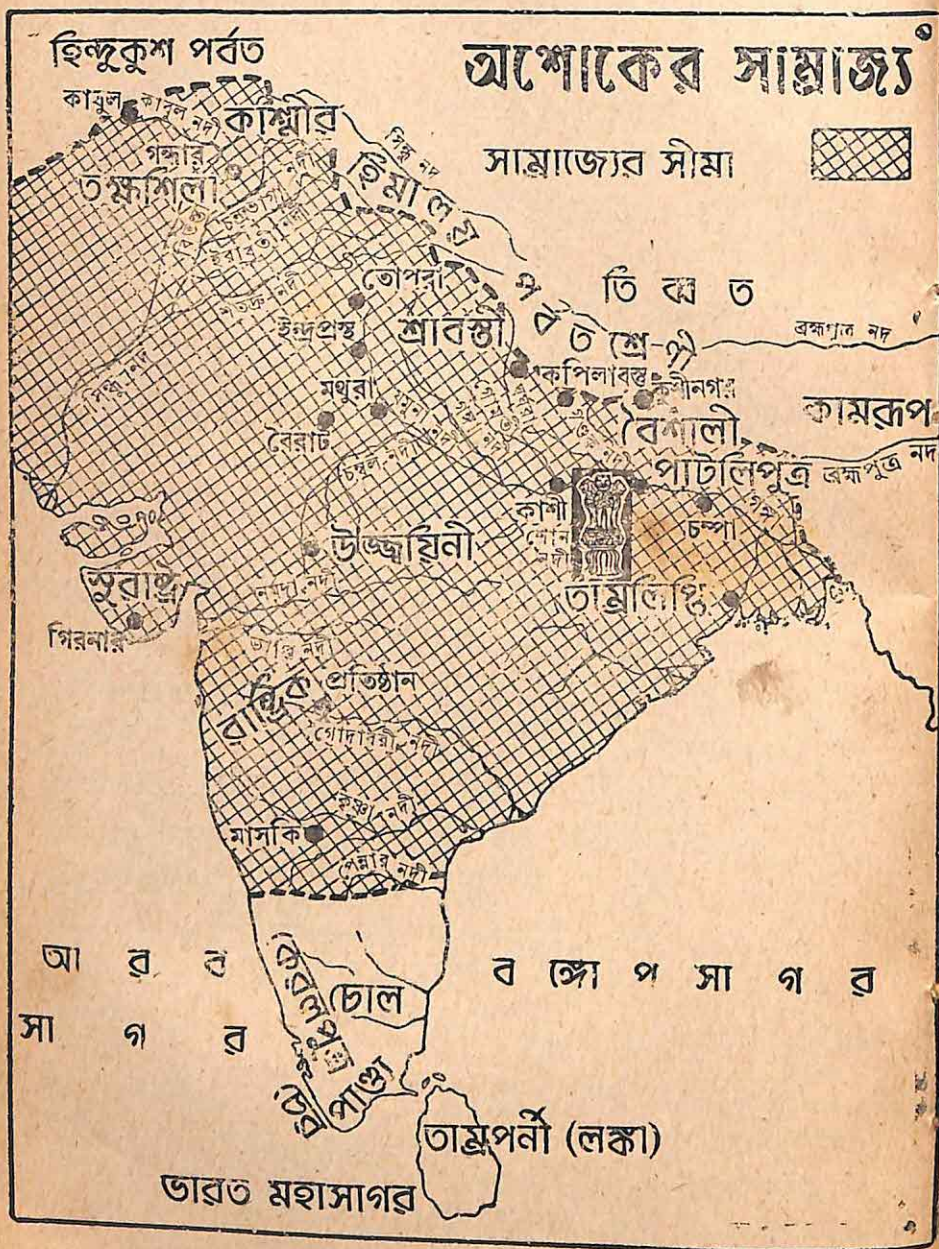
সেলিউকস যখন সসৈন্যে এই সকল রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন তখন চন্দ্রগুপ্ত সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া পারস্যের সীমানা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যের প্রসার ঘটাইয়াছিলেন। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী শাসক তাঁহার পুত্র **বিন্দুসার**। তিনি পৈতৃক
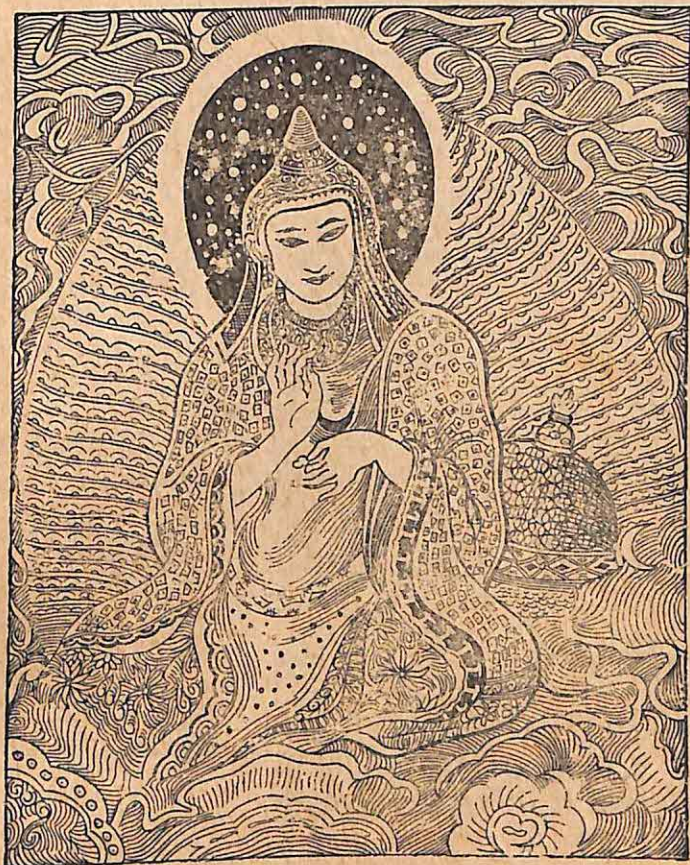
সম্রাট অশোক

সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা পুরামাত্রায় বজায় রাখেন। ইহার পর মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন তাঁহার বিশ্ববন্দিত পুত্র **অশোক**। কলিঙ্গ জয় করিয়া

তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের আয়তন ও মর্যাদা যেভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্বে আর কেও করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রভুত্ব সুদূর দক্ষিণ ভারত এবং ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে অবস্থিত অঞ্চল ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম বৃহত্তম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

অশোকের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইহার পর শুঙ্গবংশের রাজারা একশো বৎসরের কিছু বেশী সময় উত্তর ভারতের কতক অঞ্চলে তাঁহাদের শাসন অব্যাহত রাখেন।

কুষাণ শক্তির উত্থান ও পতন—শুঙ্গশাসনের অবসানের একশো বৎসরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এক বিদেশী উপজাতি গড়িয়া তোলে একটি শক্তিশালী রাজ্য। এই উপজাতি কুষাণ নামে পরিচিত। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম **কনিষ্ক**। পূর্বে মগধ হইতে পশ্চিমে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাঁহার শাসনাধীন ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার)। কুষাণ বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা বাসুদেব। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে কুষাণ রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

কনিষ্কের ভগ্নমূর্তি

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে

কুষাণদের উচ্ছেদের পর গুপ্তবংশের অধীনে মগধকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত**। ইনি লিচ্ছবির রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার শক্তিবৃদ্ধির পথ সুগম করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যসীমা মগধ হইতে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

দ্বিতীয় গুপ্তসম্রাট **সমুদ্রগুপ্ত** ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী বীর। আর্যাবর্তের বহু রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি সমগ্র উত্তরাপথ তাঁহার শাসনাধীনে আনেন। তাঁহার সামরিক খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, সমতট, কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা এবং পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতের কয়েকটি রাজ্য বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লন।

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

বীণাবাদনরত মূর্তি

আর্যাবর্তে প্রভুত্ব স্থাপনের পর সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব উপকূল ধরিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হন দক্ষিণ-ভারত অভিমুখে। এই অঞ্চলের বহু রাজা পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অবশ্য সমুদ্রগুপ্ত এই সকল রাজ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপন করেন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও শক রাজারা তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া চলিতেন। তাঁহার সার্বভৌম শক্তির খ্যাতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্তের পর মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন তাঁহার পুত্র **দ্বিতীয়**

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল। সৌরাষ্ট্র ছাড়া আরও যে কয়টি অঞ্চল তিনি জয় করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিল বঙ্গদেশ এবং সিন্ধুনদের অপর তীরে অবস্থিত বাহ্লীক জাতির অধিকৃত অঞ্চল। বিদর্ভের রাজকন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়া তিনি মধ্য ভারতেও প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

চতুর্থ গুপ্তসম্রাট **প্রথম কুমারগুপ্ত**। নূতন কোন রাজ্য জয় না করিলেও ইনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি একদিকে গ্রহণ করেন মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি, অপর দিকে অনুষ্ঠান করেন অশ্বমেধ যজ্ঞ।

গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন **স্কন্দগুপ্ত**। একদিকে মধ্য ভারতে পুষ্যমিত্র এবং অপর দিকে হূণদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ পতনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটরা পূর্ব ভারত ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে তাঁহাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গলার ইতিহাস ঃ বিম্বিসার হইতে শুরু করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। এইবার এই সময়ে আমরা যে রাজ্যে বাস করি সেই বঙ্গ বা বাঙ্গলার ইতিহাসে কি ঘটিতেছিল তাহা আলোচনা করিব। এখানে বঙ্গ বা বাংলা বলিতে আমরা বুঝিব ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার আগেকার অবিভক্ত বাঙ্গলা।

বাঙ্গলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চব্বিশ পরগণায় মাটির তলা হইতে বহু পুরাতন উপকরণ খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাঙ্গলা দেশে সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়াছিল।

আর্যরা যখন উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে তাঁহাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন তখনও বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গলার অধিবাসীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। এজন্য আর্যদের লেখায় বাঙ্গলাদেশ অথবা উহার

অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রশংসার কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। বরং বলা হইয়াছে যে, তীর্থভ্রমণ ছাড়া অন্য কোন কারণে যদি আর্যরা বাংলাদেশে আসিতেন তবে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

কিন্তু আর্যদের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের পরিচয় গড়িয়া উঠিতে খুব বেশী দিন লাগে নাই। রামায়ণে বলা হইয়াছে যে অযোধ্যা এবং বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে বিবাহ হইত। রাজা দশরথের যুগেও আমরা বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির কথা শুনিতে পাই। মহাভারতে বাঙ্গলাদেশের অন্তর্ভুক্ত সূহ্ম (হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের দক্ষিণভাগ), পুণ্ড্র (বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর জেলা), বঙ্গ (বাঙ্গলার দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চল) প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল রাজ্যের রাজারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে ছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ভারতের অনেক রাজ্যের রাজাই উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তের রাজা।

মহাবীর ও বুদ্ধের যুগের সাহিত্যেও বাঙ্গলার অধিবাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। একখানি জৈন পুঁথিতে রাঢ়া অঞ্চলের (গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে অবস্থিত) অধিবাসীদের বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণের কথা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধদের পুঁথিপত্রেও গৌড় ও পুণ্ড্রের ভাষাকে 'অসুর ভাষা' বলা হইয়াছে।

আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন পূর্বভারতে অবস্থিত ছিল প্রাচ্য ও গঙ্গরিডই নামে দুইটি রাজ্য। এই দুইটি রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক ও অশ্বারোহী ছাড়া ছিল ৪০০ শিক্ষিত রণহস্তী। একজন গ্রীক লেখকের মতে এই সব রণহস্তীর কথা শুনিয়া আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করে।

মৌর্যযুগে মগধকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে এক বিশাল সাম্রাজ্য। একের পর এক রাজ্য জয় করিয়া মগধের রাজারা প্রায় গোটা ভারতবর্ষ জুড়িয়া গড়িয়া তোলেন তাঁহাদের সাম্রাজ্য। বাঙ্গলা দেশের উত্তরাঞ্চল (পুণ্ড্রবর্ধন), তাম্রলিপ্ত (তমলুক) এবং সমতট (ত্রিপুরা ও মধ্যবঙ্গ) অঞ্চল ইহাদের অধীন ছিল। অশোকের মহাস্থান লিপিতে উত্তর বঙ্গের ধন ও শস্যসম্পদের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

গুপ্তসম্রাটদের আমলে বাঙ্গলাদেশ তাঁহাদের শাসনধীন ছিল। সমুদ্রগুপ্ত

পুষ্করণের (বাঁকুড়া) রাজা চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গলা অধিকার করিয়া লন। সমতটের রাজাও তাঁহাকে কর দিতে রাজী হন। গুপ্তযুগে উত্তরবঙ্গকে বলা হইত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি।

ভারত ও বহির্বিশ্ব ঃ ভারতের তিন দিক ঘিরিয়া সমুদ্র, উত্তর দিকে বিশাল দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা। কিন্তু প্রাকৃতিক এইসব বৈশিষ্ট্য ভারতের পক্ষে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারতীয়রা **পশ্চিম এশিয়ার** সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। পরে মৌর্য আমল হইতে এই যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক হইয়া উঠে। প্রাচীন যুগ হইতে একদিকে **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া** এবং অন্যদিকে **মধ্য এশিয়ার** সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত এই যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল সিংহল, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ এবং ব্রহ্মদেশ। এই সব অঞ্চলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব ব্যাপক ছিল। এখানকার মন্দির এখনও ভারতীয় শিল্পকীর্তির নিদর্শন রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

মধ্য এশিয়ার বিরাট অঞ্চলেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার অরেল স্টাইন খোটান অঞ্চলের মাটি খুঁড়িয়া আবিষ্কার করিয়াছেন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এবং ভারতীয় ভাষায় লেখা বহু পুঁথি ও দলিলপত্র।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বহু গুহা চীনা তুর্কীস্তানে পাওয়া গিয়াছে। কুচা, তুরফান, আকলু ও কাশগড়েও পাওয়া গিয়াছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন। মধ্য-এশিয়ার যে সব দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটিয়াছিল তিব্বত তাহাদের অন্যতম। ভারতের একাধিক মনীষী বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচারে **জীবন** উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব** এবং **কমলশীল**। কিন্তু ইঁহাদের কীর্তিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে **অতীশ দীপঙ্করের** কীর্তি। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনিয়া তিব্বতের রাজা তাঁহাকে নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর পরিণত বয়স এবং দুর্গম পথের বাধা উপেক্ষা করিয়া নেপালের পথে উপস্থিত হইলেন তিব্বতে। জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতে আজও দীপঙ্করের নাম পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়।

ধর্ম ছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমেও ভারত ও তিব্বতের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

বিদেশী পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতঃ শিলালিপি, মুদ্রা, পুঁথিপত্র এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অন্যান্য নিদর্শনের সাহায্যে আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানিতে পারি। এই সকল ভারতীয় উপকরণ ছাড়া বিদেশী ভ্রমণকারীদের সমসাময়িক লেখা হইতেও প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে পারি। বিদেশীদের মধ্যে যিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিখিয়া গিয়াছেন তিনি একজন গ্রীক, নাম **মেগাস্থিনিস**। ইনি সিরিয়ার রাজা সেলিউকস-এর দূত হিসাবে মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বইয়ের নাম **ইণ্ডিকা**। বইটি আমরা পুরাপুরি পাই নাই, ইহার কয়েকটি টুকরা শুধু আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে। তবু এই সব লেখা হইতে আমরা মৌর্যযুগের ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় জনগণের বৃহত্তম অংশ গঠিত ছিল কৃষকদের লইয়া। তিনি এদেশের অফুরন্ত কৃষিসম্পদের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইত। এই কারণে এদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ হইত

না। জলসেচের ব্যবস্থাও সুন্দর ছিল। গ্রীক রাজদূতের মতে শিল্পসম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ ছিল।

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের চরিত্রের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করিত না। এইজন্য টাকা ধার দেওয়ার সময় সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হইত না। মামলা-মোকদ্দমারও তেমন প্রচলন ছিল না। তবে অপরাধ করিলে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

মেগাস্থিনিসের মতে নারীরা সেই যুগে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রীক লেখকের মতে মৌর্যযুগে কাহাকেও দাসরূপে গণ্য করা হইত না। হয়তো তিনি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, গ্রীস-দেশের ক্রীতদাস-প্রথার মতো কোন প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল না।

মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা **সাতটি শ্রেণীতে** বিভক্ত ছিল। এই সাতটি শ্রেণীর তালিকাও তিনি দিয়াছেন, যেমন **সৈনিক, কৃষক, অমাত্য, বণিক** ইত্যাদি। এখানে মেগাস্থিনিস বর্ণের উল্লেখ করেন নাই, তিনি প্রধান কয়েকটি বৃত্তির কথা বলিয়াছেন মাত্র।

মেগাস্থিনিস-এর সাতশ' বছর পরে ভারতে আসিয়াছিলেন চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন**। এই সময়ে মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। ফা-হিয়েন প্রায় ১৫ বৎসর এদেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল একটি অতিশয় সমৃদ্ধ নগর। এখানকার অধিবাসীরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিত। মৌর্য আমলের রাজপ্রাসাদের যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল তাহার সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। উহা কোন মানুষের হাতে তৈয়ারী বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পাটলিপুত্র ছাড়া ফা-হিয়েন আর যে সকল নগর পরিদর্শন করেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পুরুষপুর, তক্ষশিলা, মথুরা, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, কান্যকুব্জ, রাজগৃহ এবং বোধগয়া। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সব নগরের বৌদ্ধমঠগুলির

পূর্ব গৌরবের অনেকখানি তখন হ্রাস পাইয়াছিল। মধ্যদেশে তখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাধান্য। তবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা পরস্পরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করিত।

মেগাস্থিনিস্-এর মতো ফা-হিয়েনও ভারতীয়দের চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। রাজা এবং ধনী ব্যক্তিদের দানে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিত বহু আরোগ্যশালা, সঙ্ঘারাম এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান। কয়েকটি সঙ্ঘারাম বিদ্যা-চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গুপ্তযুগের একটি স্তম্ভ
[ভাস্কর্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন]

মেগাস্থিনিস্ মৌর্যযুগের দণ্ডবিধির কঠোরতার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ফা-হিয়েন-এর মতে গুপ্তযুগে দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না। দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল না বলিয়াই মনে হয়। রাত্রিকালে গৃহস্থেরা দরজা খোলা রাখিয়া নির্ভাবনায় ঘুমাইতে পারিতেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানে। পূর্বযুগের তুলনায় জাতিভেদ প্রথা অনেক বেশী কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ এবং অস্পৃশ্য জাতির লোকদের বাস করিতে হইত নগরের বাহিরে।

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতি চর্চা : পৃথিবীর যে সকল দেশ আদি সভ্যতার পীঠস্থানরূপে গর্ববোধ করিতে পারে, ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম। সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা এবং রামায়ণ-মহাভারত যুগের সভ্যতার প্রায় সকল চিহ্নই আজ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু মৌর্যযুগ হইতে শুরু করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু সাক্ষ্য এখনও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের বহু শিল্পকীর্তি প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-

কীর্তির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। সংস্কৃতির দিক হইতে সর্বোচ্চ উন্নতি ঘটিয়াছিল গুপ্তযুগে। শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যবিদ্যায়, সাহিত্যে, এক কথায়, সংস্কৃতি চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই যুগে ঘটিয়াছিল বিস্ময়কর উন্নতি। গুপ্তযুগের মন্দির ও ভাস্কর্যের অনেক চিহ্নই লোপ পাইয়াছে। কিন্তু যে কয়টি এখনও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে তাহাদের শিল্প-সৌন্দর্য অতুলনীয়। কি দেবদেবীর মূর্তি, কি জীবজন্তু অথবা বৃক্ষলতা সকল ক্ষেত্রেই শিল্পী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পীরা কিরূপ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় বহন করিতেছে দিল্লীতে অবস্থিত চন্দ্ররাজার লৌহস্তম্ভ। এই স্তম্ভটি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ইহাই যে, দেড় হাজার বৎসরের পুরানো হওয়া সত্ত্বেও ইহার মসৃণতা এতটুকু হ্রাস পায় নাই।

মা ও ছেলে (অজন্তা চিত্র)

সারনাথ স্তম্ভশীর্ষ

এই যুগের সঙ্গীতবিদ্যা এবং চিত্র শিল্পও খুব উন্নত মানের ছিল। অজন্তা ও বাঘের গুহাচিত্রাবলী ভারতীয় চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। প্রায় অন্ধকার এই সব গুহায় অসাধারণ দক্ষতায় শিল্পীরা উজ্জ্বল বর্ণ এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন মানুষ, দেবদেবী, গাছ-পালা, ফুল, লতাপাতা, পশুপক্ষী ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের জীবন্ত প্রতিলিপি।

গুপ্তযুগ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। অমর কবি কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন গুপ্তযুগেই। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। তিনি যে সব সংস্কৃত কাব্য ও নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন

অজন্তার একটি অসাধারণ চিত্রশিল্প—বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গের জন্য
নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে
(Mural Painting—অজন্তা)

তাহা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কালিদাস ছাড়া আর যাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের লেখক বিশাখদত্ত এবং 'মৃচ্ছকটিক'-এর রচয়িতা শূদ্রক। এই যুগেই পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং রামায়ণ-মহাভারত এই দুই মহাকাব্য পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করে।

গুপ্ত যুগের অপর মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্ত। ইঁহাদের রচনা হইতে সেই যুগে বিজ্ঞানচর্চা কিরূপ উন্নত ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

গুপ্ত শাসনকালে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানেও বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। এই সময় শল্যচিকিৎসা এবং চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতীয় চিকিৎসকগণ অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। এই যুগে গাছপালা ও নানা রকম ধাতু হইতে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর ব্যাপক প্রচলন হয়। রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রেও ভারতীয় মনীষা উহার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল তক্ষশিলা এবং নালন্দা। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধের সমসাময়িক কালেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বিম্বিসার যখন মগধের নরপতি তখন চিকিৎসক
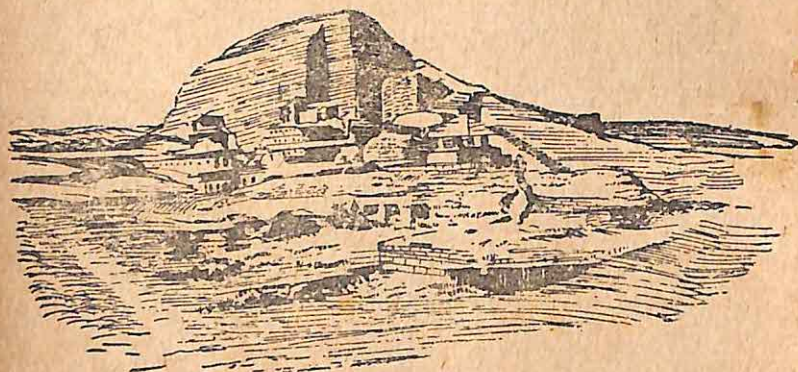
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ

হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন জীবক। ইনি তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। জাতকের বিভিন্ন কাহিনীতে তক্ষশিলার উল্লেখ রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে শিক্ষার্থীরা আসিত। দরিদ্র ছাত্ররা এখানে বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইত।

পরবর্তী যুগে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে **নালন্দার** মহাবিহার। এটি অবস্থিত ছিল পাটলিপুত্রের দক্ষিণে, বর্তমান পাটনা জেলার অন্তর্গত বড়গাঁওয়ে। গুপ্তযুগ হইতে শুরু করিয়া হিন্দুযুগের শেষ অবধি নালন্দা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে নিজের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন এখানে দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ভারতের বাহির হইতে, এশিয়ার

বিভিন্ন দেশ হইতেও এখানে শিক্ষার্থীরা সমবেত হইত। হিউয়েন-সাঙ্ নিজে এখানকার অধ্যক্ষ বিখ্যাত বাঙালী মনীষী পণ্ডিতপ্রবর শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ লিখিয়া গিয়াছেন, "রাজারা বংশ-পরম্পরায় শুধু যে বিরাট আবাসিক অট্টালিকা ও শিক্ষাভবন নির্মাণ করাইয়া দিতেন তাহা নয়, অগণিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত পার্থিব দ্রব্যই সরবরাহ করিতেন। একশতটি গ্রামের রাজস্ব এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইত।"

অনুশীলন

১। আর্যজাতি ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা। বেদের সংখ্যা চার—ঋক, সাম, অথর্ব ও যজুঃ। প্রত্যেক বেদে রহিয়াছে চারটি ভাগ—ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানিতে পারি। বৈদিক যুগের শেষ ভাগের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে। এই দুটি গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মহাকাব্য।

২। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে পূর্ব ভারতে আবির্ভূত হন জৈনধর্মের ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ, পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য এবং জাতিভেদের কঠোরতার ইহারা বিরোধী ছিলেন। আচার আচরণে এবং চিন্তায় তাঁহারা অহিংস নীতি অনুসরণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের বহু নরনারী জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শেষোক্ত ধর্মমত কালক্রমে ভারতের বাহিরেও প্রসার লাভ করিয়াছিল।

৩। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় মগধকে কেন্দ্র করিয়া। মগধরাজ্যের ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির সূচনা করেন বিম্বিসার। তাঁহার অন্যতম বংশধর উদয়ীর রাজত্বকালে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পাটলিপুত্র নগরে। পরে শিশুনাগ এবং আরো পরে নন্দবংশের রাজা মহাপদ্মের নেতৃত্বে মগধের প্রভুত্ব আর্যাবর্ত জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। নন্দবংশের অবসানে প্রতিষ্ঠিত হয় মৌর্য শাসন। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত। ইনি আর্যাবর্ত ছাড়া দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চল মগধ সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী রাজা বিন্দুসার এই সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন পৃথিবী-বন্দিত রাজর্ষি অশোক। তাঁহার রাজত্বকালে একদিকে যেমন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া স্থাপিত হয় এক অখণ্ড সাম্রাজ্য, অপর দিকে তেমনই বৌদ্ধধর্ম পরিণতি লাভ করে এক বিশ্বব্যাপী ধর্মরূপে।

৫। মৌর্য বংশের শাসনকাল ১৩৭ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। অতঃপর কিছুকাল মগধে রাজত্ব করেন শুঙ্গবংশীয় নরপতিরা। এই সময়ে গ্রীক শক্তি পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। গ্রীক ছাড়া আর যে সকল বিদেশী জাতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পহ্লব, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ অধিপতি কণিষ্ক। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার)। বিদেশী হইলেও তিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুষাণরা যখন আর্যাবর্তে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তখন দক্ষিণ ভারতে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন সাতবাহন বংশের নরপতিরা।

৬। কুষাণ শাসনের অবসানে মগধকে কেন্দ্র করিয়া পুনঃস্থাপিত হয় রাজনৈতিক ঐক্য। এই ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত বংশ। এই বংশের রাজা সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ছিলেন অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী বীর। গুপ্ত শাসকরা শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই কীর্তি অর্জন করেন নাই, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপেও তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগ ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।

৭। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এবং রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও এই অঞ্চলের কথা বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশ বহুকাল পর্যন্ত আর্যদের প্রভাব এড়াইয়া নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রাখিয়াছিল; পরে ধীরে ধীরে আর্যসভ্যতা বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ করিতে শুরু করে। আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক কালে পূর্ব ভারতে প্রাচ্য এবং গঙ্গরিডই নামে দুটি ক্ষমতাশালী রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। পরে ৭ম শতকের প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এক শক্তিশালী রাজ্য। এই রাজ্য সমসাময়িক কালে আর্যাবর্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে গণ্য হইত।

৮। প্রাকৃতিক দিক হইতে সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সহিত বহির্বিশ্বের সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বিদেশী যে সকল জাতি ও উপজাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে শুরু করে কালক্রমে তাহারা ভারতবর্ষের সমাজের

অঙ্গীভূত হইয়া উহাকে বৈচিত্র্য দান করে। আরও একটি কারণে ভারতবর্ষ বিদেশীদের কাছে ঋণী। বিদেশীদের লেখা বৃত্তান্ত হইতে ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন সম্পর্কে আমরা বহু মূল্যবান তথ্য জানিতে পারি। এই লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস এবং চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন।

৯। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতীয় ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্য-এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া প্রসার লাভের সুযোগ পায়। ইহার ফলে গড়িয়া উঠে বৃহত্তর ভারত।

১০। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নানা খাতে প্রবাহিত হইত। শিল্পে, ভাস্কর্যে, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার নানা ক্ষেত্রে— সাহিত্যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, চিত্রকলায়, ধাতুবিদ্যায় ভারতের মনীষীরা আপন প্রতিভার স্বাক্ষর স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। উত্তর দাওঃ—

(ক) চারটি বেদের নাম লেখ। (খ) বেদ চারিটির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতম? (গ) আর্য বলিতে কাহাদের বুঝায়? (ঘ) চতুরাশ্রম কি কি?

২। রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটি আদর্শ-চরিত্র পুরুষ ও নারীর নাম লেখ।

৩। জৈনধর্মের প্রধান উপদেশ কি কি?

৪। গৌতম বুদ্ধ কি ভাবে সিদ্ধি লাভ করেন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। কোন্ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়? কোথায় বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন? কোথায় তাঁহার দেহান্তর ঘটে?

৬। বুদ্ধের ধর্মমত সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি রচনা লেখ।

৭। নীচে প্রাচীন ভারতের কয়েকজন নরপতির নাম লেখা হইল—সময়-সীমা অনুসারে ইহাদের নাম সাজাওঃ সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, বিন্দুসার, মহাপদ্ম নন্দ ও বিম্বিসার।

৮। প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত তিনটি রাজধানীর নাম লেখ।

৯। বিম্বিসার হইতে অশোক—এই যুগের মধ্যে কোন্ কোন্ রাজবংশ মগধে রাজত্ব করিয়াছিল? তাহাদের নাম লেখ।

১০। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল? তিনি কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করেন?

১১। সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১২। প্রাচীন বৈদিক ও পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে কি বলা হইয়াছে?

১৩। (ক) উত্তর দাও: রামায়ণ ও মহাভারত হইতে বাঙ্গলাদেশ সম্পর্কে কি পরিচয় পাওয়া যায়? (খ) প্রাচীন যুগে পূর্ব ভারতে দুটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল—ইহাদের নাম কি? (গ) মৌর্য ও গুপ্ত শাসন যুগে বাঙ্গলা দেশের সহিত মগধ রাজ্যের কি সম্পর্ক ছিল? (ঘ) শশাঙ্ক কে ছিলেন?

১৪। মেগাস্থিনিস কে? তিনি কোন্ সময় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন? তিনি ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে কি লিখিয়া গিয়াছেন?

১৫। ফা-হিয়েন ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চল পরিদর্শন করেন? ভারতবর্ষের সমাজ সম্পর্কে তিনি কি লিখিয়াছেন?

১৬। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কি জান?

১৭। গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৮। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে কি জান?

———